ইসলামী শিক্ষার আলোকে

মানবজীবন বিকাশের পর্যায়সমূহ

প্রণয়ন:

প্রফেসর ড. খালিদ বিন হামিদ আল হাযেমী

প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই ও তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের অনিষ্ট থেকে এবং আমাদের পাপকর্ম থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে তিনি বিপথগামী করেন, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। **অতঃপর:**

একজন ব্যক্তি জীবন বিকাশের যে পর্যায়গুলো অতিক্রম করে তা এবং প্রতিটি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি আগ্রহ কোন আধুনিক বা পাশ্চাত্য গবেষণার ফসল নয়, যেমনটি কিছু মানুষ মনে করে থাকে। বরং মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যেসব ধাপ অতিক্রম করে তা যেমন কুরআন ও নবীর সুন্নাহ বর্ণনা করেছে, তেমনি ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে যে ধাপগুলি অতিক্রম করে তাও ব্যাখ্যা করেছে। যেমন: শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্য, তারপর ধীরে ধীরে দুর্বলতার পর্যায় থেকে অতি বার্ধক্য পর্যন্ত।

কুরআন ও সুন্নাহতে ইসলামী নির্দেশাবলী রয়েছে যা এই পর্যায়গুলিকে নির্দেশ করে এমন দিকে যা এগুলোকে বিচ্যুতি ও বিপথগামীতা থেকে সংশোধন ও রক্ষা করে। পূর্ববর্তী আলেমদের রচনায় এই পর্যায়গুলো সম্পর্কে ইলমী খেদমতও বিদ্যমান আছে, যেমন ইবনুল জাওযী রহঃ, যিনি এই বিষয়ে একটি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন, যার নাম "তানবীহুন নায়েম"। এতে তিনি মানুষের জীবনের পর্যায়গুলোকে পাঁচটি পার্যায়ে ভাগ করেছেন। সেগুলো হল: শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য ও অতি বার্ধক্য কাল। অনুরূপভাবে ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়াহ তার কিতাব "তুহফাতুল মাওদুদ" এ জীবনের কিছু পর্যায় উল্লেখ করেছেন।

এই অধ্যয়নটি যা পাঠকের হাতে রয়েছে, তা উপরে যা বলা হয়েছে সেটাকে জোড়ালো করার একটি প্রয়াস যে, ইসলামের নির্দেশাবলী মানুষকে তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পথপ্রদর্শনের জন্য অত্যন্ত মনোযোগ দিয়েছে, এমনভাবে যা জীবনের প্রতিটি স্তরের জন্য উপযুক্ত। সাধারণ নির্দেশিকা সহ যা একজন ব্যক্তির জীবনের সমস্ত পর্যায়ে প্রয়োজন।

মানুষ তার গঠনের প্রথম ধাপে মাতৃগর্ভে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে, যতক্ষণ না সে ঐ আকার ও অবয়বে পৌঁছায় যা আল্লাহ তার জন্য চেয়েছেন। এটি মহান আল্লাহর মহা ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত এবং তা এক অলৌকিক বিষয় যা তাঁর প্রভুত্ব এবং উপাসত্বের প্রমাণ বহন করে। তাছাড়া তিনিই এই সৃষ্টিকে তার দেহ মাটির সাথে মিশে গিয়ে বালিকণার মতো হয়ে যাওয়ার পর তার আগের রূপে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। কাজেই সুমহান আল্লাহ কতই না পবিত্র, যার কুদরত ও শক্তি তাঁর সৃষ্টির মাঝে প্রকাশ পায়। তিনি শুক্রাণুকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করেন, তারপর শুক্রাণু একটি রক্তপিন্ডে পরিণত হয়, অতঃপর তা মাংসপিন্ডে রূপ নেয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٖ مِّن طِينٖ ١٢ ثُمَّ جَعَلۡنَٰهُ نُطۡفَةٗ فِي قَرَارٖ مَّكِينٖ ١٣ ثُمَّ خَلَقۡنَا ٱلنُّطۡفَةَ عَلَقَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ فَخَلَقۡنَا ٱلۡمُضۡغَةَ عِظَٰمٗا فَكَسَوۡنَا ٱلۡعِظَٰمَ لَحۡمٗا ثُمَّ أَنشَأۡنَٰهُ خَلۡقًا ءَاخَرَۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحۡسَنُ ٱلۡخَٰلِقِينَ ١٤﴾ [المؤمنون: ١٢-١٤]

অর্থ: [নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির উপাদান হতে।* অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে)।* পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে, অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে; তারপর

তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!] সূরা আল-মুমিনূন: ১২-১৪। তিনি আরো বলেন:

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٍ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلًا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخٗاۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبۡلُۖ وَلِتَبۡلُغُوٓاْ أَجَلٗا مُّسَمّٗى وَلَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ [غافر: ٦٧]

অর্থ: [তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায়। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে তোমরা অনুধাবন কর।] সূরা গাফির: ৬৭। তিনি আরো বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّنَ ٱلۡبَعۡثِ فَإِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّضۡغَةٖ مُّخَلَّقَةٖ وَغَيۡرِ مُخَلَّقَةٖ لِّنُبَيِّنَ لَكُمۡۚ وَنُقِرُّ فِي ٱلۡأَرۡحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ نُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلٗا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ لِكَيۡلَا يَعۡلَمَ مِنۢ بَعۡدِ عِلۡمٖ شَيۡـٔٗاۚ وَتَرَى ٱلۡأَرۡضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡهَا ٱلۡمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ وَأَنۢبَتَتۡ مِن كُلِّ زَوۡجِۭ بَهِيجٖ﴾ [الحج: ٥]

অর্থ: [হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে (ভেবে দেখ যে,) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর বীর্য হতে, তারপর রক্তপিন্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিন্ড হতে; যাতে আমি তোমাদের নিকট (আমার সৃজনশক্তির মহিমা) ব্যক্ত করি। আমার ইচ্ছা অনুযায়ী তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি; পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় অকর্মণ্য (স্থবিরতার) বয়সে; যার

ফলে সে যা কিছু জানত, সে সম্বন্ধেও সজ্ঞান থাকে না।] সূরা আল-হাজ্জ: ৫। তিনি আরো বলেন:

﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۝٥٤﴾ [الروم: ٥٤]

অর্থ: [আল্লাহ তিনি তোমাদেরকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।] সূরা আর-রূম: ৫৪।

তাছাড়া রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**নিশ্চই তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টির উপকরণ নিজ নিজ মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে অবস্থান করে, এরপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে চল্লিশ দিন অবস্থান করে। এরপর তা মাংসপিন্ডে পরিণত হয়ে (আগের ন্যায় চল্লিশ দিন) থাকে। এরপর আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন; সে তার মাঝে রুহ ফুৎকার দেয় এবং তাকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়: ফলে সে লিপিবদ্ধ করে তার রিযিক, তার আয়ু, তার আমল, এবং সে কি পাপী হবে না পূণ্যবান হবে।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

কুরআনের আয়াতগুলি মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যে পর্যায়গুলি অতিক্রম করে তা ব্যাখ্যা করেছে; তারপর জন্মের পর থেকে শৈশব, তারপর যৌবন ও শক্তির সবচেয়ে কঠিন পর্যায়, তারপর ধীরে ধীরে দুর্বলতার দিকে ধাবিত হওয়া। যাতে সে বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়ে সবশেষে চরম বার্ধক্যাবস্থায় পৌঁছায়; যাতে তার জ্ঞান, বুঝ, সচেতনতা ও পরিণত অবস্থার পরে অবুঝ ও সবকিছুই তার অজানার ন্যায় হয়ে যায়। তবে যদি সর্বশক্তিমান আল্লাহ এর আগেই তার মৃত্যু দিয়ে থাকেন তাহলে ভিন্ন কথা।

শিক্ষাবিদগণ শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষের বিকাশের পর্যায়গুলোতে মনোযোগ দিয়েছেন; প্রতিটি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য, এর শারীরিক, মানসিক, বিবেক-বুদ্ধি ও আবেগ-অনুভূতিজনিত বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাগত সক্ষমতা জানতে। যাতে প্রতিটি পর্যায়ের উপযোগী পাঠ্যক্রম তৈরিতে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায়; এর বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুসারে। এবং যাতে নির্দেশনা, কাউন্সেলিং ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সহজতর করা যায়। কারণ, যে কোনো জিনিসের বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে তা মোকাবেলা করার প্রক্রিয়া সহজতর হয়।

একজন ব্যক্তি জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত যে পর্যায়গুলো অতিক্রম করে তা এখানে সুস্পষ্ট করা হবে। উক্ত পর্যায়গুলো হচ্ছে:

(১) দুগ্ধপানকাল

(২) শৈশবকাল (নার্সারি পর্যায়)

(৩) বাল্যকাল (ভালমন্দ যাচাইয়ের বয়সকাল)

(৪) প্রাপ্তবয়স্ককাল

(৫) যৌবনকাল

(৬) বার্ধক্যকাল

আমি মহান আল্লাহর কাছে এ কাজের সফলতা কামনা করছি।

ডক্টর খালিদ বিন হামিদ আল হাযেমী

প্রথমত: দুগ্ধপানকাল

দুগ্ধপানকাল সম্পর্কে ধারণা:

এটি সেই পর্যায় যেখানে শিশু তার পুষ্টির জন্য তার মায়ের দুধের উপর নির্ভর করে। বুকের দুধ খাওয়ানোর পর্যায়টি ভ্রূণের জন্মের তারিখ থেকে শুরু হয়ে তার জীবনের দ্বিতীয় বছরের শেষ পর্যন্ত থাকে, যার সময়কাল দুই বছর। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ﴾ [البقرة: ٢٣٣]

অর্থ: [আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, এটা তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়।] সূরা আল-বাকারা: ২৩৩।

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যাবলী:

এই পর্যায়টি গর্ভ থেকে ভ্রূণের বিচ্ছেদ এবং এমন একটি জগতে প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় যার সাথে আগে পরিচিত ছিল না। এখন তার উপর খাদ্য, চিকিৎসা এবং স্নেহ ও যত্নের দিক থেকে পরিবারের প্রভাব শুরু হয়। ((তাদের জন্মের পর তাদের সেবাযত্ন করা আরো জরুরী, আর তাদের প্রতি সচেতনতা অবলম্বন করা আরো জোড়ালো হয়। কেননা যতক্ষণ গাছের শাখা-প্রশাখা গাছের সাথে সংযুক্ত থাকে ততক্ষণ বাতাস ও ঝড় সহজে এটাকে টলাতে বা উপড়ে ফেলতে পারে না। আর এগুলোকে যদি এটা থেকে আলাদা করে অন্য জায়গায় রোপণ করা হয় তবে কীটপতঙ্গ তাতে আক্রমণ করবে এবং সামান্য বাতাসও এটিকে দুলাবে, এমনকি উপড়ে ফেলবে।))[১]

---

(১) দেখুন: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রচিত 'তুহফাতুল মাওদূদ বি-আহকামিল মাওলূদ: পৃ: ১৭১।

((ফলে যখন ভ্রূণ গর্ভ ত্যাগ করে, তখন সে যাতে অভ্যস্ত ছিল তা থেকে সব বিষয়ে একযোগে প্রস্থান করে এবং হঠাৎ এই পরিবর্তনের কষ্ট তার জন্য ধীরে ধীরে পরিবর্তনের কষ্টের চেয়ে বেশি।))[১]

এই পর্যায়ে শিশুর চারিত্রিক দিকগুলোর অধিগ্রহণকে প্রভাবিত করে এমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্তন্যপান। শিক্ষাবিদরা স্বীকার করেন যে, শিশু স্তন্যদানকারিনীর দুধের দ্বারা এবং এ দুধপানের মাধ্যমে স্তন্যদানকারিনী মহিলার নৈতিকতায় প্রভাবিত হয়। এর অর্থ হল: উত্তম চরিত্র, ভাল পরিবার ও তাকওয়া সম্পন্না মহিলাকে বেছে নিতে হবে। ইবনে কুদামা রাহঃ বলেন: (আবু আবদুল্লাহ দুশ্চরিত্রা ও মুশরিক মহিলাদের দ্বারা দুধ খাওয়ানো অপছন্দ করতেন।) উমর বিন খাত্তাব রাঃ ও উমর বিন আব্দুল আজীজ রহঃ বলেছেন: (দুধ প্রভাব বিস্তারকারী, তাই বাচ্চাকে কোন ইহুদী, খ্রিস্টান বা ব্যভিচারিণী মহিলার দুধ পান করাবে না। কারণ একজন দুশ্চরিত্রা মহিলার দুগ্ধপান করলে তা যেমন তাকে শিশুটির মা বানায়, তেমনি স্তন্যদানকারিনীর মতো তাকেও অনৈতিকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে এ মহিলার কারণে তিরস্কৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একজন মুশরিক নারীর কাছ থেকে স্তন্যপান করানো তাকে এমন মা করে যে, তার মাঝে শিরক থাকা সত্ত্বেও সে মায়ের মর্যাদা লাভ করে। কখনো কখনো এমন শিশু তার ধর্মের প্রতি ভালবাসায় তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। অনুরূপভাবে মূর্খ মহিলার বুকের দুধ পান করানোও অপছন্দনীয়; যাতে শিশুটি তার মূর্খতার সাদৃশ্য গ্রহণ না করে। বলা হয়: ((স্তন্যপান স্বভাব-চরিত্র পরিবর্তন করে দেয়। আল্লাহই ভালো জানেন।))[২]

---

(১) পূর্বোক্ত, পৃ: ১৭১।

(২) দেখুন ইবনে কুদামা রচিত 'আল-মুগনী': ৯/২২৮।

যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে তার অন্তর্গত হলো, দুগ্ধশিশুকে হারাম দুধ পান করা থেকে বিরত রাখা; এর দাম হারাম হোক বা স্তন্যদানকারী নারী এমন হোক যে হারাম খাওয়া থেকে বিরত থাকে না। ইমাম গাজ্জালী রহঃ বলেন: ((হারাম উৎস থেকে প্রাপ্ত দুধে কোন বরকত নেই। যদি কোন শিশু এটা পান করে, তাহলে তার স্বভাব মন্দের সাথে মিশে যাবে। ফলে তার স্বভাব-চরিত্র মন্দের সাথে যা উপযুক্ত তার দিকে ঝুঁকবে।))[১]

ঠিক যেমনভাবে খারাপ স্তন্যপান করানো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, তেমনি ভাল স্তন্যপান করানোয় শিশুর আচরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কেননা একজন মমতাময়ী ও ধার্মিক মা যখন তার সন্তানকে আলিঙ্গন করে তখন তাকে প্রশান্তি দেয়, মানসিক পুষ্টি দেয় এবং স্তন্যপান করিয়ে তাকে উপকারী পুষ্টি উপাদান দেয়।[২] বস্তুত বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াটি মায়ের সাথে শিশুর সংস্পর্শের একটি মাধ্যম। তাই সে মায়ের কোলে, বাহুতে ও তার বুকে উষ্ণতা ও নিরাপদ বোধ করে।

((বুকের দুধ শিশুকে শুধুমাত্র পুষ্টি জোগায় ও তার জৈব ক্ষুধা মেটায় না, বরং এটি তার আদর, ভালবাসা ও যত্নের প্রতি তৃষ্ণার্ত আত্মাকেও পুষ্ট করে।))[৩] ফলে সে সুখ ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, যা তাকে মেজাজ ও আচরণে মধ্যপন্থী করে

---

(১) দেখুন ইমাম গাজ্জালী রচিত 'ইহয়াউ উলূমিদ দ্বীন': ৩/৭১।

(২) গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে এবং প্রসবের শুরুতে, স্তন এক ধরণের সাদা-হলুদ বর্ণের তরল নিঃসরণ করে। এটা আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি যে, এই তরলটি দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা গঠিত যা শিশুকে রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। সন্তান জন্মের পরের দিন থেকে দুধ তৈরি হতে শুরু করে। এটি প্রথমে অল্প পরিমাণে স্টার্চ ও শর্করা সহ প্রায় পানির মত তরল হয়, তারপরে এর উপাদানগুলি ঘনীভূত হয়। এভাবে সময়ের সাথে সাথে এর স্টার্চ, শর্করা ও চর্বি বাড়তে থাকে। দেখুন: যিলালুল কুরআন: ৬/৩৪৩৮।

(৩) দেখুন মুহাম্মাদ সাইয়্যেদ যাবলায়ী রচিত 'আল-উমূমা ফিল কুরআন ও ওয়াস সুন্নাহ': পৃ: ১৫০।

তোলে। কারণ, সে স্তন্যপান করানো থেকে বঞ্চিত হওয়ার নেতিবাচক প্রভাব এবং পরবর্তী মানসিক পুষ্টি থেকে দূরে থাকে।

- এই পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে, শিশুটি তার অনুভূতি ও ব্যথা-বেদনা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম, তবে সে কান্নার উপর নির্ভর করে এবং তার হাত বা বুড়ো আঙুলটি এমন অংশে স্থাপন করে যেখানে ব্যথা অনুভব করে।
- এই পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল, সে ভীতিকর দৃশ্য এবং বিরক্তিকর নড়াচড়া দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়। ফলে এটা তার বুঝশক্তি বিনষ্টের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
- এই পর্যায়টি মাতৃগর্ভ থেকে সদ্য বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে শিশুর শরীর দুর্বল মর্মে বিবেচিত হয়। এ প্রেক্ষিতে, শিশুকে তার সময়ের আগেই হাঁটানো উচিত নয়; তাদের পা পেঁচ খাওয়া ও বাঁকা হওয়ার সম্ভবনা কারণে। তদ্রুপভাবে তাদের তিন মাস বয়স না হওয়া পর্যন্ত যেখানে সেখানে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

এই পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ঘন ঘন কান্নাকাটি করা এবং দুধ পান করার জন্য চিৎকার করা, বিশেষ করে যদি সে ক্ষুধার্ত থাকে। এখানে, শিশুর কান্না ও চিৎকারে বাবা-মায়ের বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। এই কান্না থেকে সে অনেক উপকৃত হয়। কারণ এটি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম করায়, তার অন্ত্রকে প্রসারিত করে, তার বুক প্রশস্ত করে, তার মস্তিষ্ককে উষ্ণ করে, তার মেজাজকে রক্ষা করে এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রকে বিদ্যমান থাকা বর্জ্যগুলোকে বের করে দিতে উদ্দীপিত করে। অনুরূপভাবে কান্না মস্তিষ্কের শ্লেষ্মা বের করে দেয় ... ইত্যাদি।

এই পর্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল, শিশুর জন্য একবারে বুকের দুধপান ত্যাগ করা কঠিন। তাই ধীরে ধীরে তার দুধ ছাড়ানো উচিত। কারণ, হঠাৎ করে পরিবর্তন করা স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়। এটা তাকে স্তন চোষার বিকল্প হিসেবে আঙ্গুল চোষার দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা:

আযান: মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই ইসলাম তার নৈতিক লালন-পালনের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়। তাকে ইসলামী পরিচর্যা ও শিষ্টাচার দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখে। নবজাতকের কানে প্রথম যে জিনিসটি বেজে ওঠে তা হল তাওহীদের বাণী। আবদুল্লাহ ইবনে আবী রাফি' তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: ((**আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ-কে হাসান বিন আলী এর কানে আযান দিতে দেখেছি, যখন ফাতিমা রাঃ তাকে জন্ম দেন।**)) সুনানে আবু দাউদ ও তিরমিযি। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ আযানের উপকারিতা সম্পর্কে বলেন: ((এটা অনস্বীকার্য যে, আযানের প্রভাব তার অন্তরে পৌছায় এবং সে অনুভব না করলেও তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এছাড়া আরো ফায়দা রয়েছে, যেমন শয়তান আযানের শব্দ শুনে পালিয়ে যায়।))[১]

তাহনীক: তারপর শিশুটিকে একটি খেজুর দ্বারা তাহনীক করাবে, যেমনটি আল্লাহর রাসূল সাঃ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। আবু মূসা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((**আমার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাই আমি তাকে নবী সাঃ-এর কাছে নিয়ে আসি। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং তার তাহনীক করলেন।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

তাহনীক মানে কিছু চিবিয়ে বাচ্চার মুখে দেওয়া এবং তা তার মুখের তালুতে ঘসে দেয়া। নবজাতক শিশুকে খাওয়ার অভ্যাস করতে এবং এতে শক্তিশালী হওয়ার জন্য এমনটি করা হয়। এক্ষেত্রে উত্তম হল খেজুর দিয়ে করা, যদি খেজুর না পাওয়া যায় তবে রুতাব বা আধা-পাকা খেজুর। অন্যথায় মিষ্টি জাতীয় কিছু, এক্ষেত্রে মধু সবচেয়ে উত্তম।[২]

---

(১) তুহফাতুল মাওদূদ: পৃষ্ঠা ২২।

(২) দেখুন: ইবেন হাজার রচিত ফতহুল বারী: ৯/৫৮৮।

সম্ভবত এর হিকমত হচ্ছে: জিহ্বা, তালু ও দুই চোয়ালের নড়াচড়ার মাধ্যমে মুখের পেশীগুলোকে শক্তিশালী করা, যাতে নবজাতক স্তন্যপান এবং দুধ শোষণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।[১]

আকীকা: ইসলামী শিষ্টাচারের অন্যতম হল: শিশুর আগমনে খুশি ও আনন্দ প্রকাশ হিসেবে তার পক্ষ থেকে আকীকা করা। উম্মে কারায আল-কা'বিয়া রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাঃ-কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: ((**ছেলে সন্তানের পক্ষে দুটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষে একটি বকরী। আকীকার পশু নর বা মাদী যাই হোক না কেন তাতে তোমাদের কোন অসুবিধা নেই।**)) সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ।

মাথা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ: নবজাতককে রক্ষা করে এমন একটি ইসলামী শিষ্টাচার হল: সপ্তম দিনে তার মাথা থেকে চুল অপসারণ করা। মুমিনদের মা আয়েশা রাঃ বলেন: ((**আল্লাহর রাসূল সাঃ সপ্তম দিনে হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে আকীকা দেন এবং তাদের নামকরণ করেন। আর তাদের মাথা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু মুছে ফেলার আদেশ দেন।**)) মুস্তাদরাক হাকেম।

নামকরণ: একটি শিশু যে নৈতিক আতিথেয়তা পায় তার অন্যতম হল: তার জন্য একটি ভাল নাম নির্বাচন করা। নবী সাঃ বলেন: ((**আজ রাতে আমার একটি ছেলের জন্ম হয়েছে, আমি আমার পিতা ইবরাহীমের নামে তার নাম রেখেছি।**)) সহীহ মুসলিম। তিনি আরো বলেন: ((**আল্লাহর কাছে তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় নাম হল আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান।**)) সহীহ মুসলিম।

---

(১) দেখুন: আব্দুল্লাহ বিন আলওয়ান রচিত কিসসাতুল হিদায়া: ১/৪২৫।

যেহেতু নামসমূহ অর্থবাহক, তাই এটা হিকমতের দাবী যে, ব্যক্তি ও তার নামের মাঝে সম্পর্ক ও যথার্থতা থাকতে হবে। বরং বস্তুর উপর তার নামের প্রভাব রয়েছে এবং নামের উপর বস্তুরও প্রভাব রয়েছে- সৌন্দর্য, কদর্যতা ও ভদ্রতার ক্ষেত্রে।

তাছাড়া রাসূলুল্লাহ সাঃ ভালো নাম পছন্দ করতেন।

নামকরণের সময়: এমনও হাদিস এসেছে যে, নবী সাঃ কিছু ছেলেদের জন্মের দিন সকালে নাম রেখেছেন। আবার এমনও হাদিস রয়েছে যে, নামকরণটি সপ্তম দিনে হয়েছিল। ইমাম বুখারী এভাবে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন: "অধ্যায়ঃ নবজাতকের জন্মের পর সকালে তার নাম রাখা যারা তার পক্ষ থেকে আকীকা করেনি এবং তার তাহনিক করা।" এটি একটি চমৎকার সমাধান: যে ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে আকীকা করতে চায় না সে তার রাখার জন্য সপ্তম দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না এবং যে তার পক্ষ থেকে আকীকা করতে চায় সে তা সপ্তম দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।[১] ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: (শিশুর জন্মের দিনেই তার নাম রাখা জায়েয, তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করাও জায়েয এবং আকীকার দিন পর্যন্ত দেরী করাও জায়েয। বস্তুত এ সম্পর্কিত বিষয়টি ব্যাপক।)[২]

খতনা: শিশুর চরিত্রগত যে বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা হয় তার মধ্যে রয়েছে খতনা। নবী করীম সাঃ বলেছেন: **((পাঁচটি বিষয় ফিতরাতের অন্তর্ভূক্ত: খাতনা করা, নাভির নিম্নাংশের লোম চেছে ফেলা, গোঁফ ছাঁটা, নখ কাটা এবং বগলের পশম উপড়ে ফেলা।))** সহীহ বুখারী ও মুসলিম। অভিভাবক অবশ্যই বয়ঃসন্ধির আগেই ছেলের খতনা করাবেন, কারণ এটি এমন একটি বিষয় যা ছাড়া ওয়াজিব পূরণ করা যায় না। খতনার মাঝে রয়েছে পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সাজসজ্জা, চরিত্রের উন্নতি এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ

---

(১) দেখুন: ইবেন হাজার রচিত ফতহুল বারী: ৯/৫৮৭-৫৮৮।

(২) তুহফাতুল মাওদূদ: পৃষ্ঠা ৭১।

করা, যা অতিরিক্ত হলে একজন ব্যক্তিকে পশুদের সাথে সংযুক্ত করে এবং যদি এটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে তবে এটি তাকে জড় বস্তুর সাথে সংযুক্ত করে। ফলে খতনা ভারসাম্য রক্ষা করে। এই কারণেই আপনি অনেক খতনা না করা পুরুষ এবং খতনা না করা মহিলাদের খুঁজে পাবেন যারা মিলনে অতৃপ্ত। সম্ভবত এটিই যৌন অভিমুখে মানুষের আচরণকে পরিমিত করে তোলে। ফলে তার কামনা তাকে পরাভূত করতে পারে না, যাতে সে এটির দাস হয়ে যায়। অনুরূপভাবে সেও তার কামনাকে সম্পূর্ণ দমায় না, যাতে বিবাহ করতে না চাওয়ার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি রোধ হয়ে যায়। কাজেই এখানে কোন বাড়াবাড়ি বা অবহেলা নেই, বরং এটা তাকে একটি পরিমিত মেজাজ বজায় রাখতে ও তাড়াহুড়ো না করে বিষয়গুলিকে সাবলীলভাবে মোকাবেলা করতে সাহায্য করে এবং এটি তার আচরণকে প্রভাবিত করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

এই পর্যায়ে, শিশুর চরিত্রকে প্রভাবিত করে এমন শিষ্টাচারের প্রতি ইসলামের গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়, যেমন বুকের দুধ খাওয়ানো, তাহনিক, আকীকা, নামকরণ, আযান দেয়া ও খতনা। এটা ইসলামী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা মুসলিম চরিত্র এবং ইসলামী ব্যক্তিত্বের নানা দিক থেকে এটা অন্যদের থেকে আলাদা।

ব্যবহারিক শিক্ষা:

- নবীর সুন্নাত অনুসরণে এসব বিষয় প্রয়োগে গুরুত্বারোপ করা জরুরী: নবজাতকের তাহনিক করা, তার ডান কানে আযান দেওয়া এবং সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে আকীকা করা; ছেলে সন্তান হলে দুটি বকরী, আর মেয়ে হলে একটি। শিশু প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই তার খতনা করা, মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া এবং একান্ত প্রয়োজন না হলে গুঁড়ো দুধের আশ্রয় না নেওয়া। কারণ, বুকের দুধের উপাদানগুলোতে পুষ্টির এমন গুণাগুণ রয়েছে যা অন্য কিছুতে পাওয়া যায় না।

- একজন সৎ, ধার্মিক স্তন্যদানকারী মহিলা নির্বাচন করা; যদি মা ছাড়া অন্য কারো বুকের দুধ খাওয়ানো হয়।
- আশা করা যায় যে, এই বিষয়গুলো তার সুস্থ শারীরিক বিকাশের মাধ্যমে নৈতিক গঠনে প্রতিফলিত হবে। কারণ, একটি সুস্থ শরীর একটি সুস্থ মন তেরি করে, যা একজন ব্যক্তির আচরণ ও কর্মের উপর বড় প্রভাব ফেলে।
- সামাজিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমগুলো এক্ষেত্রে তাদের শিক্ষাগত ভূমিকা পালন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: শৈশবকাল (নার্সারি পর্যায়)

শৈশবকাল সম্পর্কে ধারণা:

এটাকে নার্সারি পর্যায়ও বলা হয়। আরবীতে "مرحلة الحضانة" বলা হয়। "الحضانة" হল: পাখি কর্তৃক তার ডিমকে স্বীয় পাখার নিচে এনে নিজের শরীরের সাথে জড়িয়ে তাতে তা দেয়া, অনুরুপভাবে কোন মা কর্তৃক স্বীয় সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরা, বাচ্চাকে প্রতিপালন করা। যেহেতু অভিভাবক বাচ্চাকে স্বীয় কোলে জড়িয়ে ধরে তাই এটাকে এই নামকরণ করা হয়েছে।[১]

পারিভাষিক অর্থে: ((এটা বেশিরভাগ সময়ে শিশুকে তার জন্য ক্ষতিকারক জিনিস থেকে রক্ষা করা এবং তার যত্ন নেয়া বুঝায়। যেমন তাকে গোসল করানো, কাপড় ধুয়ে দেয়া, শরীরে তৈল মালিশ করা, সুরমা লাগানো, তাকে দোলনায় বেল্ট লাগিয়ে দেয়া, তাকে ঘুম পারিয়ে দেয়া, ইত্যাদি যা তার জন্য ভাল।))[২] ইমাম জুরজানি বলেছেন: ((এর মানে হল শিশুকে লালন-পালন করা।))[৩] অর্থাৎ: এই পর্যায়ে শিশুর জন্য তার মায়ের তত্ত্বাবধান অন্য যে কোনো জায়গার চেয়ে বেশি প্রয়োজন। অতএব শিশুর এ পর্যায়টি যা সে অতিক্রম করে তা উপরোক্ত ব্যাখ্যার সাথে যুক্ত। আর এই পর্যায়টি শুরু হয় তৃতীয় বছরের সূচনা থেকে ষষ্ঠ বছরের শেষ পর্যন্ত।[৪]

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যাবলী:

---

(১) দেখুন: লিসানুল আরব: ১২/১২৩।

(২) দেখুন: ইবনে যাওবান রচিত মানারুস সাবিল: ২/২৭৯।

(৩) আত-তা'রিফাত: পৃঃ ৮৮।

(৪) নার্সারি পর্যায় বা শৈশবকালের সংজ্ঞার মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, দুগ্ধপানকালের পর্যায়টি এর অন্তর্ভুক্ত, এটি থেকে আলাদা নয়, যেমনটি ফিকহের কিতাবগুলোতে স্বীকৃত।

এই পর্যায়ে, শিশুর সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণ উপলব্ধি করার, বোঝার ও অর্জন করার ক্ষমতা প্রকাশ পায় এবং তার ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ে, শিশু তার চারপাশের লোকদের, বিশেষ করে পরিবারের সদস্যদের অনুকরণ করে এবং তাদের আচরণ, চিন্তাভাবনা, ভাষা, ধর্ম এবং নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয় ও তাদের ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে।

তাই, নৈতিক লালন-পালনের প্রক্রিয়ায় এই পর্যায়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়, যেখানে তার প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা প্রদর্শিত হয়। নবী করীম সাঃ বলেছেন: ((**প্রতিটি শিশু ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও?**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। তিনি সাঃ আরো বলেছেন: ((**প্রত্যেক নবজাতকই মিল্লাতের উপর জন্মগ্রহণ করে।**)) সহীহ মুসলিম। ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেছেন: (এ হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, শিশু ইসলাম ধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে।)[১]

এটি শিশুর ধর্মীয় ও নৈতিক দিকনির্দেশনায় পরিবারের ভূমিকার গুরুত্বকে তাগিদ দেয়। কারণ, একটি শিশুর নিকট ভালো ও মন্দের ধারণা বড়দের থেকে আলাদা; ছোট শিশুর দৃষ্টিতে ভাল হল সেই কাজগুলি যা সম্পাদন করা তার জন্য সহজ। অন্যদিকে মন্দ হল সেই কাজগুলি যা বড়দেরকে খুশি করে না, বিশেষ করে মাকে খুশি করে না।

সন্তানের সাথে তার পিতামাতার সংযোগ তার আচরণের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। যখনই তারা তার থেকে দূরে থাকে, তখন সে অযত্ন, ভয় ও অবহেলিত বোধ করে। এ কারণেই, শিশুর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং তাকে এড়িয়ে যাওয়ার

---

(১) দেখুন: দার-উ তায়ারুজিল আকল ওয়ান নাকল: ৮/২৬৬।

কারণে আমরা এ জাতীয় আবেগী প্রশ্ন শুনতে পাই: তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? সে এমনটি জিজ্ঞেস করে আন্তরিকতার সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য।

অতএব, "একটি শিশুর নৈতিক বিকাশ নির্ভর করে তার মা, পিতা, পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে তার সম্পর্কের পরিমাণ এবং তার সামাজিক পরিবেশের উপর।))[১] এটা বাড়ির কাজের মেয়েদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতার ক্ষতির দিকটি নিশ্চিত করে; শিশুদের প্রতি তাদের আন্তরিকতা ও মমতার পাশাপাশি যদি তাদের মাঝে সততা ও ধার্মিকতা না থাকে। কেননা যারা শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল নয় তারা প্রায়শই তাদের যত্ন নেয় না। এমনকি সংশোধন করার পরিবর্তে তাদের আচরণকে নষ্ট করতে পারে।

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা:

ইসলাম এই পর্যায়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে; সন্তানের পৃষ্ঠপোষকতা এবং দেখাশুনা করা বাধ্যতামূলক। কারণ, তাকে ছেড়ে গেলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই তাকে অবশ্যই ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে হবে। অনুরূপভাবে তার ভরণপোষণ করাও আবশ্যক।

তেমনিভাবে যে ব্যক্তি ফাসেক বা মূর্খ তার তত্ত্বাবধানমূলক দায়িত্ব বিলুপ্ত হবে। কারণ, সে এ দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত নয়। কাজেই কোন মায়ের অবস্থা যদি এমন হয় যে, সে সন্তানের দেখভাল করার উপযুক্ত নয়, তাহলে না থাকার মতই। এমতবস্থায় তার নিকটবর্তী কারো নিকট এ দায়িত্ব বর্তাবে। আর যদি পিতামাতা উভয়েই সন্তানের হেফাজতের জন্য যোগ্য না হয়, তাহলে এটি তাদের নিকট ব্যক্তির কাছে চলে যাবে,

---

(১) দেখুন: ফুয়াদ আল-বাহা রচিত 'আল-উসুসুন নাফিসাহ লিন-নুমু': পৃঃ ৪২৩।

এমতবস্থায় তারা না থাকার মতো।[১] কাজেই একজন অভিভাবককে হেফাজতের জন্য যোগ্য হতে হবে, যা শিশুকে বিচ্যুতি ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করবে।

এই পর্যায়ে শিশুকে স্নেহ ও যত্নের মাধ্যমে ভালবাসা দেখানোর মাধ্যমে তার মানসিক গঠনেরও প্রয়োজন। যাতে এটি তার জন্য ইতিবাচক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে যা তাকে তার প্রিয় মানুষের প্রতিটি নির্দেশনা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

নবীজী সাঃ ছেলেদের প্রতি সদয় ছিলেন এবং তাদেরকে সালাম দিতেন। ইয়ালা ইবনে মুররা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: **((আমরা নবী সাঃ-এর সাথে আহারের এক দাওয়াতে রওয়ানা হলাম। তখন হুসাইন রাঃ রাস্তায় খেলছিলেন। নবী সাঃ দ্রুত সকলের আগে অগ্রসর হয়ে তার দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন। তখন বালকটি এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো এবং নবী সাঃ তাকে হাসাতে লাগলেন। শেষে তিনি তাকে ধরে ফেললেন। তিনি এক হাত তার চোয়ালের নিচে রাখলেন এবং অপর হাত তার মাথায় রাখলেন, তারপর তাকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর নবী সাঃ বললেন: "হুসাইন আমার থেকে এবং আমি হুসাইনের থেকে"। যে ব্যক্তি হুসাইনকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। হুসাইন আমার নাতিদের একজন।))** সুনানে তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **((রাসূলুল্লাহ সাঃ একবার হাসান বিন আলীকে চুম্বন করেন। ঐ সময় আকরা ইবনু হাবিস বললেন: আমার দশটি পুত্র আছে, আমি তাদের কাউকেই কোন দিন চুম্বন করিনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন: যে দয়া করে না তাকে দয়া করা হয় না।)** সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এই নববী ভালবাসা দুই নাতীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা অন্যান্য শিশুদের জন্যও প্রসারিত ছিল। একজন ব্যক্তির এমনই হওয়া উচিত। আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত

---

(১) দেখুন: ইবনে কুদামাহ রচিত 'আল-মুগনী': ৯/২২৯-২৯৭।

যে, **রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দোয়া করতেন এবং কিছু চিবিয়ে তাদের মুখে দিতেন। একবার একটি শিশুকে তার কাছে আনা হল। অতঃপর শিশুটি তার শরীরে পেশাব করে দিল। তারপর তিনি পানি আনিয়ে পেশাবের জায়গায় ঢেলে দিলেন। আর তা ধুলেন না।**) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এই যত্ন শিশুকে তার পিতামাতা এবং যারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের কাছে প্রিয় করে তোলে, ফলে সে তাদের নির্দেশনা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয় এবং তাদের সাথে ঝগড়া বা তর্ক করতে অপছন্দ করে। এটি যেন একটি ভিত্তি যার উপর নৈতিক লালন-পালনের জন্য ইসলামী নির্দেশাবলী নির্মিত।

যেহেতু শিশুর বোঝার ও উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাকে নির্দেশনা গ্রহণ করতে সক্ষম করে, তাই এই পর্যায়ের শেষদিকে সে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের কিছু সূরা মুখস্থ করতে পারে। কারণ পবিত্র কুরআন হল নৈতিকতার সিলেবাস।

এই পর্যায়ে শিশুর মুখস্থ করার সক্ষমতা যে বিষয়টি নিশ্চিত করে তা হল: আমরা আমাদের সমসাময়িক বাস্তবতায় এমন অনেক শিশুর উপস্থিতি লক্ষ্য করি যারা এখনও সাত বছর বয়সে পৌঁছেনি, অথচ তারা পবিত্র কুরআনের অনেক সূরা মুখস্ত করে ফেলেছে। ইমাম শাফেয়ী রহঃ বলেন: (আমি সাত বছর বয়সে কুরআন মুখস্ত করেছি এবং দশ বছর বয়সে মুয়াত্তা মুখস্ত করেছিলাম।)[১] সাহল বিন আবদুল্লাহ আল-তাস্তারি বলেন: (আমি ছয় বা সাত বছর বয়সে কুরআন শিখেছি এবং মুখস্ত করেছি।)[২]

বাচ্চাদেরকে আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করার প্রতি অভ্যস্ত করতে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। তবে এই পর্যায়ে মনোযোগ সর্বদা পড়াশুনার দিকে নয়, বরং সন্তানের

---

(১) দেখুন: ইমাম সুয়ূতী রচিত "ত্ববাকাতুল হুফ্ফায": পৃঃ ১৫৪।

(২) ইহয়াউ উলূমিদ্দীন: ৩/৭৩।

সামর্থের পরিমাণে হওয়া উচিত। কারণ, এই পর্যায়ে শিশুর খেলাধুলার প্রতি ঝোঁক থাকে। তাই শিশুকে খেলা থেকে বিরত রাখা এবং তাকে পড়াশুনার জন্য সর্বদা চাপে রাখা তার হৃদয়কে নিস্তেজ করে, তার বুদ্ধিমত্তাকে নষ্ট করে এবং তার জীবনকে কঠিন করে তোলে। পরিশেষে সে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য ছলচাতুরী অবলম্বন করে।

এই পর্যায়ের শুরুতে যে বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া উচিত তার অন্যতম হল, এই সাক্ষ্যটি মুখস্থ করানো যে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ"/আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

পাঁচ বছর বয়সে উপনীত হলে মুখস্থ করার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে ইবনুল জাওযী রহঃ বলেন: (যে ব্যক্তি সন্তান প্রাপ্ত হয়, সে যেন তাকে শৈশব থেকেই পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা শেখানোর চেষ্টা করে, তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং যখন সে পাঁচ বছর বয়সে উপনীত হয় তখন যেন তাকে বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ করতে শেখায়।)[১] তার চরিত্র ও আচরণ যেন সুন্দর হয় সেজন্য তাকে ভাল কথাবার্তা ও আহারের শিষ্টাচারিতায় অভ্যস্ত হতে হবে, বয়স্কদের সম্মান করতে হবে, ঘরের পবিত্রতাকে সম্মান করতে হবে এবং পিতামাতার প্রতি ভদ্র হতে হবে; মহান আল্লাহর এই বাণীর অনুসরণে:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤]

অর্থ: [আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে

(১) দেখুন: আল-হাস্সু আলা হিফযিল ইলম: পৃঃ ১৭।

ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।* আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।] সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪।

বার্ধক্যের একটা মর্যাদা রয়েছে। আর পুর্বোক্ত আয়াতে "**তোমার নিকট**" কথাটি বার্ধক্য ও দুর্বলতার অবস্থায় আশ্রয় ও অবলম্বন খোঁজার অর্থকে চিত্রিত করে। আর ((**তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না।**)) এটা যত্ন ও ভাল আচরণের প্রথম স্তর, যাতে শিশুর নিকট থেকে বিরক্তি ও সংকোচ প্রকাশ না পায় এবং অবজ্ঞা বা খারাপ আচরণ বোধ না করে। আর ((**তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল**)) এটি একটি উচ্চতর ইতিবাচক স্তর যে, তাদের প্রতি তার কথাগুলো সম্মান ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হবে। আর ((**তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও**)) এ অভিব্যক্তিটি প্রশান্তি দেয়, হৃদয়ের গভীরে ও বিবেকের কোমলতায় পৌঁছে যায়। এটাই দয়া যা প্রশান্তিদায়ক ও কোমল, এমনকি যেন এটা এমন নম্রতা প্রকাশ যাতে চোখ তুলার সাহস নেই এবং কোন আদেশ প্রত্যাখ্যান করে না। ((**এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।**)) এটা এক কোমল স্মৃতি, এবং পিতামাতার দ্বারা লালিত দুর্বল শৈশবের স্মৃতি; তারা আজ একই রকম দুর্বলতা এবং যত্ন ও কোমল আচরণের প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে। বস্তুত যদি এই আয়াতের বিষয়বস্তু অনুসারে একটি শিশুকে বড় করা হয়, তবে সে আল্লাহর তাওফীকে শৈশবকালে এবং তার জীবনের বাকী পর্যায়ে পিতামাতার বাধ্যগত থাকবে।

একটি শিশুর চরিত্রে সৌন্দর্য যোগ করে এমন শিষ্টাচারের মধ্যে রয়েছে: বড়দের সম্মান করা এবং হাঁটাচলা, পানাহার ও কথাবার্তায় তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার মত ভদ্রতা। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেন: ((**স্বপ্নে দেখলাম,**

আমি মিসওয়াক করছি। তখন দু' লোক এসে আমাকে টেনে ধরল। একজন বড় এবং অপরজন ছোট। তারপর তাদের ছোটজনকে আমি আমার মিসওয়াকটি দিতে উদ্যত হলাম। কিন্তু বলা হলো, বড়কে দাও। অতঃপর আমি বড়জনকে মিসওয়াকটি দিয়ে দিলাম।)) সহীহ মুসলিম। তাছাড়া সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে: **((আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ইবনে যায়দ ও মুহায়্যিসা ইবনে মাসউদ ইবনে যায়িদ রাঃ বাড়ি থেকে বের হয়ে খায়বার পর্যন্ত এলেন। এরপর সেখান থেকে উভয়ে পৃথক হয়ে গেলন। তারপর হঠাৎ মুহায়্যিসা রাঃ আবদুল্লাহ ইবনে সাহলকে একস্থানে নিহত অবস্থায় পেলেন। তখন তিনি তাকে দাফন করলেন। এরপর তিনি এবং হুওয়ায়্যিসা ইবনে মাসউদ ও আবদুর রহমান ইবনে সাহল রাঃ রাসুলুল্লাহ সাঃ এর নিকট আগমন করলেন। আর তিনি ছিলেন দলের সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তি। আবদুর রহমান রাঃ তার উভয় সাথীর আগে কথা বলতে উদ্যত হলেন। রাসূল সাঃ তাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বয়সে বড় তাকে কথা বলতে দাও। সুতরাং তিনি চুপ করে গেলেন এবং তার সঙ্গীদ্বয় কথা বললেন। আর তিনিও তাদের দুজনের সাথে কথা বললেন।))**

শিশুকে যেসব বিষয়ে অভ্যস্ত করানো উচিত তার মধ্যে রয়েছে: তার ভাইদের ভালবাসা, নিজের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া, তাদের সম্মান করা, তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে শক্তিশালী করে এমন সমস্ত কিছু গ্রহণ করা। সেই সাথে এটাকে বিঘ্নিত করে ও ধ্বংস করে এমন সবকিছু এড়িয়ে চলা। সহীহ মুসলিমে এসেছে, আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: **((যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লোহা দ্বারা ইশারা করবে, ফেরেশতারা তাকে অভিসম্পাত করে, যদিও সে তার আপন ভাই হয়।))** সহীহ মুসলিম।

শিশুর বাজে অভ্যাস ও খারাপ আচরণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: বাম হাতে খেতে অভ্যস্ত হওয়া, বিসমিল্লাহ না বলা এবং তার হাত খাবার টেবিলের চারপাশে এদিক ওদিক

ঘোরাফেরা করা। ফলে বেপরোয়া হাতের নড়াচড়ার কারণে তার সাথে আহার গ্রহণকারীর পোশাক নোংরা করে এবং খাবার নাড়াচাড়া করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দেয়। এতে মানুষ কষ্ট পায়, বিশেষ করে শিশু যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকে। এ ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশনা ও শিষ্টাচার বিদ্যমান রয়েছে।

উমর ইবনু সালামাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ছোট ছেলে হিসেবে রাসূল সাঃ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করতো। রাসূল সাঃ আমাকে বললেনঃ ((**হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছে থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ পদ্ধতিতেই আহার করতাম।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ইবনে হাজার রহঃ বলেছেন: ((তিনি ইমাম কুরতুবী থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার মুদ্দাকথা হল, ডান হাত এবং যা এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয় ও যা এ থেকে নির্গত তার সবই শাব্দিক, পারিভাষিক ও দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশংসনীয়। আর বাম হাত এর বিপরীত। যখন বিষয়টি এমন, তখন গুণীজনদের নিকট উত্তম নৈতিকতা ও সদাচরণের জন্য উপযুক্ত শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত হল: সম্মানজনক কাজ ও পরিচ্ছন্ন অবস্থার জন্য ডান হাত নির্দিষ্ট করা। আর খাবার এক প্রকারের হলে নিজের কাছ থেকে আহার গ্রহণ করা। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পাশের খাবারের অধিকারী, তাই অন্য কেউ তা গ্রহণ করলে তা তার উপর সীমালঙ্ঘন হয়। তাছাড়া একাধিক হাতের স্পর্শের কারণে অন্যজনের অনীহা তৈরি হতে পারে, এ ছাড়াও এ কাজে তাতে লোভ ও উদাসীনতার

প্রকাশ ঘটে। সর্বোপরি এটা বেহুদা খারাপ আচরণের শামিল। তবে খাবারের প্রকারভেদ ভিন্ন হলে আলেমগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।[১]

এতক্ষণ যা আলোচনা করা হয়েছে তা কতিপয় ইসলামী শিষ্টাচারের প্রতিনিধিত্ব করে। এই পর্যায়ের শিশুদেরকে তা মেনে চলার জন্য পরিবার থেকেই তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেয়া উচিত। কারণ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া শিশুদের খারাপ আচরণ এই নির্দেশাবলী ও অন্যান্য ইসলামী শিষ্টাচারের প্রতি পরিবারের আগ্রহের অভাব থেকেই উদ্ভূত হয়, ফলে শিশু খারাপ অভ্যাস নিয়ে বড় হয়। যদি সে যৌবনের পর্যায়ে পদার্পণ করে, তবে যে ব্যক্তি তাকে লালন পালন করে তার জন্য তার নিন্দনীয় অভ্যাস সংশোধন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্যবহারিক শিক্ষা:

পূর্বোক্ত উপস্থাপনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোতে এই পর্যায়ের জন্য শিক্ষাগত দিকনির্দেশনা বের করতে পারি:

(১)- এই পর্যায়ে, শিশু প্রচুর ভালবাসা ও আদরের প্রয়োজন অনুভব করে। তাকে চুম্বন করে, তার মাথায় হাত বুলিয়ে এবং তার সাথে খেলা করার মাধ্যমে তাকে এটি অনুভব করানো যায়। তবে এ বিষয়ে এতটা উদাসীনতা প্রদর্শন না করে হতে হবে যাতে এটি কামশক্তির দিকে না নিয়ে যায়। এর কারণ হল: যাতে শিশুটি যাকে ভালবাসে তার নির্দেশে সাড়া দেয়, এই পর্যায়ে শিশু যে পরিমাণ ভালবাসা-স্নেহের প্রয়োজন বোধ করে তা পেয়ে সন্তুষ্ট হয় এবং যাতে সে নৈতিক স্খলন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয় এবং যাতে তার আচরণ ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

---

(১) ফতহুল বারী: ৯/৫২৩।

(২)- শিশুকে ('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ' তথা আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল) শিক্ষা দিয়ে তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা এবং তাকে এর অর্থ শেখানো। সেই সাথে শিশুর হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা জাগানো , এবং তাকে এমন কিছু গল্প শেখানো যা শিশুদের প্রতি আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা প্রকাশ করে। কারণ, এটি তার মধ্যে নবীর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করবে; ফলে সে এর উপরই বড় হবে এবং এ নৈতিকতা অনুকরণ করে চলবে।

(৩)- তাকে যতটা সম্ভব কুরআন মুখস্থ করার জন্য তালিম দেয়া, যা নৈতিকতার সংবিধান।

(৪)- অনুমতি চাওয়া, বড়কে সম্মান করা, তাকে শ্রদ্ধা করা এবং তার সেবা করার শিষ্টাচারের উপর তাকে বড় করা।

(৫)- খাবারের শিষ্টাচারে তাকে অভ্যস্ত করা যতক্ষণ না সে এটিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং তার অভ্যাসে পরিণত হয়।

(৬)- তাকে অযু এবং শরীর ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতা শেখানো, কারণ এটি ঈমান ও পরিপূর্ণ নৈতিকতার অংশ।

তৃতীয়ত: (تمييز) বাল্যকাল (ভালমন্দ যাচাইয়ের বয়সকাল)

বাল্যকাল সম্পর্কে ধারণা:

এ স্তরটি সপ্তম বছরে পদার্পণ হওয়া থেকে শুরু করে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত থাকে। আরবী শব্দ 'التَّمْيِيزُ' এর অর্থ হল: দুটি জিনিসের মাঝে পার্থক্যকরণ, এক অংশকে অন্য অংশ থেকে আলাদা করা। অর্থাৎ আলাদা ও সনাক্ত করা।(১)

এর অর্থ হল: এ স্তরের শিশু সনাক্ত ও আলাদাকরণ ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং ঠিক-বেঠিক, ভালমন্দ বুঝতে পারে; তার বিবেক ক্ষমতানুযায়ী এবং তার বয়স ও বুদ্ধির আলোকে।

এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যাবলী:

সহযোগিতা: এর স্তরের বাচ্চা অন্যদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পছন্দ করে যা তার শারীরিক উন্নতী এবং ধারণার বিকাশ ও সনাক্ত করার সক্ষমতা তৈরি করে। এভাবে সে আশপাশের সবার সাথে আন্তরিকতা অর্জন করে। এমন সহযোগিতা প্রবণতা শিশুকে কেবল উপভোগ্যতাই দেয় না, বরং এটি তাকে আত্ম-গুরুত্বের অনুভূতি এনে দেয়। কেননা সে পুরস্কার লাভের আশায় বড়দেরকে খুশি করার প্রতি আগ্রহী থাকে। ফলে এটা তাকে তার চলন সুন্দর করতে সাহায্য করে। তাই অভিভাবকদের উচিত, শিশুর এমন বৈশিষ্ট্যগুলোকে সওয়াবের আশায় ভালকাজে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

এই স্তরে শিশুর চঞ্চলতা ও কাজের স্পৃহার বিকাশ ঘটে। তাই এ সময়ে তার অভিভাবকের উচিত তাকে অলসতা ও অকর্মন্যতা এবং নিস্তব্ধতা ও অবকাশ থেকে দূরে রাখা। বরং এগুলোর বিপরীত দিকে তাকে পরিচালিত করা এবং এমন আনন্দ

---

(১) দেখুন: ইবনে মানযূর প্রণীত 'লিসানুল আরব', ৫/৪১২।

দেয়া যা তাকে কাজের প্রতি মানসিক ও শারীরিক পূর্ণতা এনে দেয়। কেননা অলসতা ও অকর্মন্যতার খারাপ ও পরিতাপযোগ্য পরিণতি রয়েছে। পক্ষান্তরে পরিশ্রম ও সাধনার শুভ পরিণাম রয়েছে; এতে সে পরিণত বয়সেও অধিক পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করার সক্ষমতা অর্জন করে। অপরদিকে নিস্তব্ধতা ও অবকাশ তাকে অন্যের সেবা-যত্নের প্রতি নির্ভরতা দিয়ে অলস করে ফেলে।

ধর্মীয় ধারণা অর্জন: শিশু তার পরিবার ও সমাজের সদস্যদের কাছ থেকে ধর্মীয় রীতিনীতি প্রত্যক্ষ করে এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রভাব পূর্ববর্তী পর্যায়ে ধর্মীয় প্রতিপালনকে শক্তিশালী করে। জরুরী হচ্ছে, এই পর্যায়ে শিক্ষককে দোয়া ও ইবাদত পালনের মধ্যে সম্পর্ক নিশ্চিত করার বিষয়টি অবশ্যই শিশুকে শেখাতে হবে, বিশেষ করে যেহেতু সে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে পদার্পণে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা করে। ফলে সে শিখবে যে সততা, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা, বিনয় ও নামায এগুলো সবই ইবাদত এবং এগুলো দোয়া কবুল হওয়ার ও সাফল্য অর্জনের পথ। এইভাবে, শিশুটি দোয়া ও কর্মের মধ্যে সম্পর্ক উপলব্ধি করতে শুরু করে এবং বুঝতে পারে যে, দোয়া হল আচরণ পরিবর্তনের একটি উপায়, অবশেষে সে মাকবুল হয়ে উঠে।"

নৈতিক ধারণা অর্জন: এই পর্যায়ে, শিশু তার কালানুক্রমিক বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রমশ বিকাশের সাথে পরিবার ও সমাজের নৈতিকতা অর্জন করে। আর এটা তাদের সাথে সম্পর্কিত তার অনুভূতি এবং সমাজের নৈতিকতার সাথে তার ক্রিয়াকলাপ সামঞ্জস্য করার ইচ্ছার কারণেই। শিশু তার শৈশবকালের শেষের দিকে যত এগিয়ে আসে, তার নৈতিক ধারণাও প্রাপ্তবয়স্কদের কাছাকাছি হতে থাকে যাদের সাথে সে উঠাবসা করে। এটি তাকে তার নৈতিক বোধ বিকাশে সহায়তা করে। ফলে সে ন্যায়-অন্যায়, সঠিক-বেঠিক ও ভাল-মন্দ ইত্যাদি অর্থ বুঝতে পারে।

ভাষাগত বিকাশ: এই পর্যায়টিকে দীর্ঘ যৌগিক বাক্যের পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই পর্যায়ে শিশু প্রতিশব্দকে আলাদা করতে এবং বিপরীত শব্দকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। এটি তার কুরআন ও নবীর হাদিসগুলি মুখস্ত করা এবং তাকে শেখানো ও সৎ কথায় অভ্যস্ত করার গুরুত্বকে নিশ্চিত করে এবং অশ্লীল শব্দ থেকে তাকে নিরুৎসাহিত করে, যাতে তার জিহ্বা এগুলোতে বিভ্রান্ত না হয়। ফলে তার চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার সময় বা অন্যদের সম্বোধন করার সময় এ শব্দগুলো স্মরণ করা সহজ হয়ে ওঠে। পরিশেষে তার মধ্যে ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল নৈতিকতার বদ্ধমূল হয়।

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা:

লালন-পালনের জন্য ইসলামী নির্দেশাবলী নববী অবস্থানে পরিপূর্ণ, যা শিশুর নৈতিক বিকাশের মান বাড়িয়ে তোলে ও তাকে উন্নত করে, সে যে ধাপগুলি অতিক্রম করে তার সাথে সঙ্গতি রেখে।

এ বিষয়ে কতিপয় ইসলামী নির্দেশিকা এখানে দেওয়া হল:

ধর্মীয় ধারণা অর্জন: ধর্মীয় দিকটি নৈতিক দিকের প্রধান খোরাক, যা এটিকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে। ইসলামী নির্দেশাবলী এই পর্যায়ে এই দিকটির প্রতি খুব মনোযোগ দিয়েছে; এই বয়সের শুরুতে শিশুকে সালাত শেখানো শুরু হয়, যা অনৈতিক ও মন্দ কাজকে নিষেধ করে। সে দশ বছর বয়সে উপনীত হবার পর তা পালনে অবহেলা করলে তাকে প্রহার করা হবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং দশ বছর বয়সে তাদের প্রহার কর, আর তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।**)) সুনানে আবু দাউদ।

সাহাবায়ে কেরাম তাদের সন্তানদের রোজা রাখাতে ও এতে অভ্যস্ত করাতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ, এতে রয়েছে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় ধৈর্য্য এবং গরীবের ক্ষুধার যন্ত্রণার অনুভব; যা একজন ব্যক্তির মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা জাগিয়ে তোলে এবং আল্লাহর প্রতি বিনয়তা তৈরি করে। সহীহ বুখারীতে এসেছে, রুবায়্যি' বিনতে মু'আব্বিয রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশুরার সকালে রাসূলুল্লাহ সাঃ আনসারদের সকল পল্লীতে এ নির্দেশ পাঠালেন: **((যার সাওম না রাখা অবস্থায় সকাল হয়েছে সে যেন তার দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকে। আর যার সাওম অবস্থায় সকাল হয়েছে, সে যেন সাওম পূর্ণ করে। রুবায়্যি রাঃ বলেন, পরবর্তীতে আমরা ঐ দিন রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশুদের রোযা রাখাতাম। আমরা তাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে ঐ খেলনা দিয়ে ইফতার পর্যন্ত ভুলিয়ে রাখতাম।))**

আচার-আচরণে শিষ্টাচার:

অনেক শিষ্টাচার আছে যা একটি শিশুর এই পর্যায়ে শেখা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, সততা ও গোপনীয়তা বজায় রাখা। এ বিষয়ে কিছু লোক তাদের বাচ্চাদের শিক্ষাদানে বা নিজেদের মধ্যে গুরুত্ব দেয় না। আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **((নবী সাঃ যখন মদিনায় এসেছিলেন তখন আমার বয়স সাত বছর ছিল। তখন উম্মে সুলাইম আমাকে আল্লাহর নবী সাঃ-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমার ছেলে, আপনি তাকে খাদেম হিসেবে গ্রহণ করুন। তারপর আমি নয় বছর ধরে রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর খেদমত করেছি। আমি যা করেছি সে সম্পর্কে তিনি কখনো আমাকে বলেননি, তুমি কেন এমন কাজ করলে? আমি যা করিনি সে বিষয়েও তিনি কখনো বলেননি, এটা করলে না কেন? একদিন আমি বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করছিলাম, তখন তিনি এসে আমাদেরকে সালাম দিয়ে আমাকে ডাকলেন এবং এক**

কাজে পাঠালেন। আমি যখন ফিরে আসি তখন তিনি বললেন, এটা কাউকে বলবে না। ইতিমধ্যে আমার মায়ের কাছে যেতে আমার দেরি হয়ে যায়, যখন তার নিকট এলাম তিনি বললেন: হে পুত্র! কিসে তোমাকে আটকে রেখেছিল? বললাম: রাসূল সাঃ তার প্রয়োজনে আমাকে কাজে পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন: সেটা কী? আমি বললাম: তিনি তো বলেছেন, কাউকে বলবে না। তখন মা বললেন: হে পুত্র! তাহলে তুমি আল্লাহর রাসূলের প্রাইভেসি গোপন রাখ।)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এভাবেই একজন মায়ের সন্তানকে শিক্ষা দেয়ার বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে; তিনি অযথা গোপনীয়তা জানার প্রতি কৌতুহল দেখাননি যা বাচ্চাকে অন্যের গোপনীয়তা প্রকাশে প্রলুব্ধ করতে পারে। তাতে তো তার সন্তানকে আমানতদারিতার অভাব জনিত কর্মে অভ্যস্ত করার কারণে তার নৈতিকতার ক্ষতি হত এবং সে গোপনীয়তা প্রকাশে কথা বলে বেড়াত।

ইসলামিক নৈতিকতার অন্তর্গত একটি বিষয় হচ্ছে যে, শিশুরা ইসলামিক অভিবাদনে অভ্যস্ত হবে। আর এটা বড়দের দ্বারা তাদেরকে সালাম দেয়া শুরু করার মাধ্যমে হতে হবে। যাতে তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং যে তাকে সালাম দেয় তার সাথে তাদের আত্মা প্রশান্ত হয়। পরিশেষে তারাই আগেভাগে তাকে সালাম দিতে উদ্যত হবে। কেননা এটা এখন তাদের ও বড়দের মধ্যে সম্পর্কের উৎস হয়ে উঠেছে। স্বয়ং রাসূল সাঃ শিশুদের সালাম দিতেন যেমনটি পূর্বোক্ত হাদিসে এসেছে, যেখানে আনাস রাঃ বলেছেন: **(তারপর রাসূল সাঃ এসে শিশুদেরকে সালাম দিলেন।)**

সহযোগিতা:

সহযোগিতার ক্ষেত্রে, শিশু এই পর্যায়ে তার সম্প্রদায়ের স্নেহ পেতে এবং তাদের মধ্যে তার অবস্থান দেখানোর জন্য সহযোগিতা করাকে পছন্দ করে। কাজেই এই সুযোগটি

কাজে লাগানো এবং তাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য তাকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ, ইসলাম এটিকে উৎসাহিত করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ [المائدة: ٢]

অর্থ: [তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না।] সূরা আল-মায়েদা: ২।

উঠতি বয়সীদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার একটি পদ্ধতি হল: তাদেরকে সৎকাজে সহযোগিতা করতে, অন্যদের সাহায্য করতে ও কল্যাণমূলক কাজে জড়িত করতে উৎসাহিত করা। রাসূল সাঃ বলেন: ((**এক ব্যক্তি মানুষকে টাকা ধার দিত, এবং সে তার সন্তানকে বলত: 'যদি তুমি অভাবগ্রস্তের নিকট আসো, তবে তাকে ক্ষমা করো। আশা করা যায় যে, আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন।' সে মারা গেলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

কোন সন্দেহ নেই যে, যে ছেলে এমন বাবার সাথে বেড়ে ওঠে যে মানুষের সাথে সহযোগিতা করে, তাহলে এটা অবশ্যই অন্যদের সাথে তার আচরণে ও সহযোগিতায় প্রতিফলিত হবে।

কাম-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ:

এই পর্যায়ের শিশু বয়ঃসন্ধির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। তাই এই পর্যায়ের শুরু থেকেই এটার জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন যাতে তার সুরক্ষা থাকে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে। এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের দৃষ্টি নত রাখতে, তাদের বিছানায় আলাদা করতে, তাদের অনুমতি চাওয়ার জন্য আদেশ করতে পারি এবং তাদেরকে এমন সব কিছু থেকে দূরে থাকতে শেখাব যা তাদেরকে দুর্বল করে তোলে।

ইসলামিক নৈতিকতার প্রতিক্রিয়ায় যা ঘরকে তার সম্মান দেয় এবং আকস্মিক দৃষ্টিশক্তিকে সীমাবদ্ধ করে,

ইসলামী নৈতিকতা গ্রহণ প্রক্রিয়া স্বরূপ -যা ঘরকে প্রাপ্য সম্মান দেয় এবং আকস্মিক দৃষ্টিপাতের আকর্ষণকে সীমাবদ্ধ করে-, এই পর্যায়ে শিশুকে অনুমতি চাইতে শেখানো উচিত, যা আমাদের এ যুগের কিছু মুসলিম পরিবারে অনুপস্থিত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسۡتَـٔۡذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٖۚ مِّن قَبۡلِ صَلَوٰةِ ٱلۡفَجۡرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعۡدِ صَلَوٰةِ ٱلۡعِشَآءِۚ ثَلَٰثُ عَوۡرَٰتٖ لَّكُمۡۚ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ وَلَا عَلَيۡهِمۡ جُنَاحُۢ بَعۡدَهُنَّۚ طَوَّٰفُونَ عَلَيۡكُم بَعۡضُكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٥٨﴾ [النور: ٥٨]

অর্থ: [হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহন করে, ফজরের সালাতের আগে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোষাক খুলে রাখ তখন এবং ‘এশার সালাতের পর; এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া (অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে) তোমাদের এবং তাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের এককে অন্যের কাছে তো যেতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।] সূরা আল-নূর: ৫৮।

আয়াতটির অর্থ হল, আপনি এমন পরিস্থিতিতে থাকেন যেখানে বাড়ির চাকর ও ছেলেমেয়েদের অনুমতি ছাড়া আপনার কাছে প্রবেশ করা উপযুক্ত নয়, তখন আপনাকে অবশ্যই তাদের শিষ্টাচার শেখাতে করতে হবে যাতে তারা এই তিন সময়ের কোন একটিতে আপনার কাছে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমে অনুমতি চেয়ে নেয়। এছাড়া এই তিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে অনুমতি না চাওয়ায়, হে অভিভাবকগণ আপনাদের কোন

পাপ নেই। অর্থাৎ প্রয়োজনের সময় তিনটি সময় ছাড়া অন্য সময়ে আপনার নিকট বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার অনুমোদন রয়েছে।

অনুমতি চাওয়ার অন্যতম কারণ সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত নবীর হাদিসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**অনুমতি গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র দৃষ্টির কারণে।**))

শিশুদেরকে যেসব বিষয়ের উপর গড়ে তোলা উচিত তার মধ্যে একটি হল, এই পর্যায়ে তাদেরকে আলাদা বিছানায় রাখা। যেমন নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং এজন্য দশ বছর বয়সে তাদের প্রহার কর, আর তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।**)) সুনানে আবু দাউদ।

বিছানা আলাদা করে দেয়ার আদেশটি ছেলেদের বিচক্ষণতা ও বোঝার বয়সে পৌঁছে যাওয়ার কারণে এবং "এই ভয়ে যে, তারা বয়ঃসন্ধিকালে বা তার কাছাকাছি বয়সে একই বিছানায় মিশলে ঘুমন্ত বা জেগে থাকা অবস্থায় একে অপরের গোপনাঙ্গ দেখতে পারে, যা তাদেরকে যৌন উত্তেজিত করবে বা তাদের চরিত্রকে কলুষিত করবে।"[১]

শিশুদেরকে যেসব বিষয়ের উপর গড়ে তোলা উচিত তার মধ্যে আরেকটি হল, শিশুকে ঢিলেঢালা মার্জিত পোশাক পারানো এবং বিশেষকরে ছেলে শিশুদের জন্য হলুদ রঙের পোশাক পরিহার করা। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((**নবী সাঃ আমার গায়ে হলুদ রংয়ের দুটি কাপড় দেখে বললেন, তোমার মা কি তোমাকে এ কাজে আদেশ দিয়েছেন? আমি বললাম, আমি এ দুটি ধুয়ে ফেলি? তিনি বললেন, বরং দুটিকেই পুড়িয়ে ফেল।**)) সহীহ মুসলিম। অতএব উচিত হল শিশুদের নিকট সাদা পোশাক পছন্দনীয় করে তুলা ও মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক থেকে

---

(১) দেখুন: তারবিয়াতুল আওলাদ: ১/৫২৪।

সাবধান করা। তার নিকট এ ধারণা জন্মাতে হবে যে, এটা নারীদের বিষয় এবং পুরুষরা এ থেকে বিরত থাকবে। তার কাছে এটি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে, কারণ এটি তাকে তরলতা এবং স্নিগ্ধতার দিকে ঠেলে দিতে পারে, তার চরিত্র নষ্ট করতে পারে, তার স্বভাব ও নারীত্বের প্রতি ঝোঁককে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে পারে এবং তাকে পুরুষত্বের রুক্ষ প্রকৃতির প্রতি বিরূপ করে তুলতে পারে।

শিশুদের নিষিদ্ধ গান শোনা থেকে বিরত রাখা উচিত। কারণ, এটি শয়তানের বাঁশি ও তার মন্ত্রগুলির একটি যা ফেতনা ও নৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনে; যেহেতু এটা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে।

ব্যবহারিক শিক্ষা:

উপরোক্ত আলোচনা থেকে, এই পর্যায়ে নিম্নলিখিত নৈতিক শিক্ষাগত নির্দেশিকা বের করা যেতে পারে:

- তাকে নামায শিখিয়ে এবং রোজা ও অন্যান্য ইবাদতের প্রশিক্ষণ দিয়ে ঈমান ও ইবাদত পালনের দিকটি তার মাঝে স্থাপন করা। কেননা ঈমান ও ইবাদতের দিকটি ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম ভিত্তি। তার মধ্যে আল্লাহ ভয় সঞ্চারিত করতে হবে এবং তাকে বুঝাতে হবে যে, আল্লাহ তাকে সর্বদা দেখছেন, তিনি তার বাহ্যিক ও গোপন সব বিষয়ই জানেন এবং তাকে অবশ্যই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য কাজ করতে হবে।

- এই পর্যায়ে, শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীকে অনেক আচরণগত শিষ্টাচার প্রদান করা এবং পূর্ববর্তী পর্যায়ে শিশু যা শিখেছে তাই যথেষ্ট মনে না করা। তাই তিনি তাকে অনুমতি চাইতে, দৃষ্টি নত করতে, পিতামাতাকে সম্মান করতে, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে অভ্যস্ত করবেন। তিনি তাকে কথায় ও কাজে সততা অবলম্বন, আমানতদারিতা ও প্রাইভেসি গোপণ রাখা শেখাবেন। এক্ষেত্রে আগে

শিক্ষককে ইসলামী নৈতিকতাসম্পন্ন হতে হবে, যাতে তিনি শিক্ষার্থীর জন্য আদর্শ হতে পারেন, এবং পরে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে এর উপর গড়ে তুলতে পারেন।

- এই সময়টির বিশেষত্ব হল যে, তখন শিশু সমাজের সদস্যদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে ভালবাসে। ফলে সে তার প্রতিবেশীদের সাথে সহযোগিতা করতে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে তাদেরকে সাহায্য করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তার এই সহযোগিতাকে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার সাথে যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে সে ইখলাছ তথা একনিষ্ঠতায় অভ্যস্ত হয় এবং সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতা ও লৌকিকতা থেকে দূরে থাকে। অনুরূপভাবে তাকে দরিদ্র ও অভাবীদেরকে সাহায্য করার, তাদের যা প্রয়োজন তার কিছু দিয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি জানানোরও নির্দেশনা দিতে হবে এবং তাকে তাদের নিকট যেতে বলতে হবে, যাতে সে আল্লাহর জন্য দান করতে অভ্যস্ত হতে পারে। আর এটা ইসলামের এক মহৎ নৈতিকতা।

- তার যৌন প্রবৃত্তিকে রক্ষা করার জন্য, তার দৃষ্টি নিচু করতে ও তার কাপড় দিয়ে নিজেকে আবৃত রাখতে অভ্যস্ত করতে হবে। তার পোশাক শালীন ঢিলেঢালা হবে, সে ছেলে শিশু হোক বা মেয়ে। তাদের প্রত্যেককে বিপরীত লিঙ্গের সাথে না খেলতে, তাদের সাথে না মিশতে বা তাদের দিকে না তাকাতে অভ্যস্ত করতে হবে। পিতামাতাদেরও অবশ্যই তাদের পোশাকে নিজেদের আবৃত রাখতে হবে এবং শালীনতা ও ভদ্রতা শিখতে হবে যাতে এই নৈতিকতাগুলি তাদের সন্তানদের কাছে যায়। তদ্রুপভাবে তাদেরকে ইসলামিক বই পড়তেও অভ্যস্ত করতে হবে যা একজন ব্যক্তিকে তার সংযমতা ও শালীনতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। নারী ও পুরুষের আকর্ষণ প্রকাশ

করে এমন অশ্লীল ম্যাগাজিন দেখা থেকে তাদেরকে সতর্ক করতে হবে, এবং অবশ্যই অভিভাবক তার বাড়িতে অথবা শিক্ষক তার স্কুলে এগুলো এলাউ করবেন না।

চতুর্থত: প্রাপ্তবয়স্ককাল

এই পর্যায়টি একজন ব্যক্তির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কারণ, তার শারীরিক, যৌন, চিন্তা-ভাবনা ও মানসিক বিকাশের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এটা দায়বদ্ধতা এবং নিজের বড় হওয়ার অনুভূতির পর্যায়। এ পর্যায়টি বয়ঃসন্ধির সাথে জড়িত।

বয়ঃসন্ধি ও প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে ধারণা:

প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়ঃসন্ধিকালের শাব্দিক বিশ্লেষণ রয়েছে, যা নিম্নরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে:

বয়ঃসন্ধিকাল: এ পর্যায়ের ছেলেমেয়েরা হল কিশোর কিশোরী: কিশোর হল এমন বালক যে বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি। এটা দশ থেকে এগারো বছর বয়সের মধ্যে। অনুরূপভাবে কিশোরী হল যে বালিকা বয়ঃপ্রাপ্তির নিকটবর্তী।[১]

প্রাপ্তবয়স্ক: যেসব ছেলেমেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে। এ সময় তাদের স্বপ্নদোষ হয়। ফলে এ সময়ে তারা সাবালক বা সাবালিকা হয়ে প্রাপ্তবয়স্ক পর্যায়ে পদার্পণ করে।[২]

এ থেকে স্পষ্ট যে, বয়ঃসন্ধিকাল হল বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বের সময়। এর সময়সীমা হল, ছেলেদের দশম থেকে একাদশ বছর এবং মেয়েদের জন্য মাসিক শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী সময়, যা বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ।

তবে মনস্তাত্ত্বিক পারিভাষিক অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক ও বয়ঃসন্ধিকাল দুটো একে অপরের সাথে সংযুক্ত, বয়ঃপ্রাপ্তির শুরু থেকে প্রজনন পরিপক্কতা পর্যন্ত। বয়ঃসন্ধিকালকে

---

(১) দেখুন: লিসানুল মিযান: ১/১৩০-১৩১।

(২) লিসানুল মিযান: ৮/৪২০।

"বয়ঃপ্রাপ্তি থেকে পূর্ণ প্রজনন পরিপক্কতা অর্জন পর্যন্ত সময়কাল" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে, এটি মেয়েদের ঋতুস্রাব এবং ছেলেদের মধ্যে স্বপ্নদোষের সূত্রপাতের সাথে শুরু হয়। অর্থাৎ বারো থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা সাধারণভাবে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আবার কেউ কেউ এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যে, এই পর্যায়টি বয়ঃসন্ধির সাথে শুরু হয় এবং যৌবনের সাথে শেষ হয়।

সম্ভবত পরিভাষাগত এ সংজ্ঞাগুলো এই পর্যায়ের শারীরিক, চিন্তা-ভাবনা ও মানসিক বিকাশগত বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবেচনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে জনৈক বিশেষজ্ঞের উক্তি পুর্বোক্ত কথাকে সমর্থন করে, তিনি বলেছেন: ((যেহেতু বয়ঃসন্ধি ও বয়ঃপ্রাপ্তির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যাবলীর আন্তঃসম্পর্কিত লক্ষণ রয়েছে, তাই আমাদের এ সম্পর্কে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ একসাথে করা ভাল; যাতে এ সম্পর্কিত ধারণাটি সঠিক হয়।))[১]

নারী ও পুরুষের মধ্যে বয়ঃসন্ধির সূচনার পার্থক্যের কারণে এবং একই লিঙ্গের মাঝে তারতম্যের কারণে একটি নির্দিষ্ট বয়সের সাথে এই পর্যায়টিকে নির্ধারণ করা কঠিন। আর এই পার্থক্য এর অগ্রগতি বা বিলম্বকে প্রভাবিত করার কারণগুলোর ফলাফল, যেমন: ((পুষ্টির পরিমাণ যা একজন ব্যক্তি গ্রহণ করে থাকে; প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন তাড়াতাড়ি বয়ঃসন্ধির দিকে নিয়ে যায়, আর প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট দেরিতে বয়ঃসন্ধির দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে পুষ্টির অভাব বয়ঃপ্রাপ্তির সূচনাকে বিলম্বিত করে এবং ব্যক্তির যৌন কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে।))[২]

বয়ঃপ্রাপ্তির গতিতে জলবায়ুও ভূমিকা পালন করে। কারণ, গরমাঞ্চলে বয়ঃসন্ধিকাল ঠান্ডা অঞ্চলের বয়ঃসন্ধিকালের আগে ঘটে থাকে। অনুরূপভাবে ব্যক্তিবিশেষ ও জেনেটিক পার্থক্যেরও প্রভাব রয়েছে। অতএব, এটাকে নারী ও পুরুষ উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে

---

(১) দেখুন: আল-উসূস আন-নাফিসাহ লিন-নুমু': পৃঃ ২৫৭।

(২) দেখুন: আল-উসূস আন-নাফিসাহ লিন-নুমু': পৃঃ ২৫৫।

মোটামুটিভাবে দশ বছর বয়স থেকে আনুমানিক ষোল বছর বয়স পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে।

বয়ঃপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- **যৌন মিলনের ইচ্ছা:** এ পর্যায়ে কিশোর-কিশোরী জৈবিক শারীরিক পরিবর্তন ও উত্তেজনার সম্মুখীন হয় যা সে আগে অনুভব করেনি। ফলে এটি তার যৌন ইচ্ছাকে উদ্দীপিত করে।

শরয়ী শিক্ষা যৌন ক্রিয়াকলাপের উপর আরোপিত বিধিনিষেধের মাধ্যমে এ প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থ নিশ্চিত করে; বৈধ বিয়ের মাধ্যমে, এবং যাতে কিশোর-কিশোরী তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পশুসুলভ উপায়ে পূরণ না করে- যেমনটি কাফের দেশে হয়।

- **বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ ও অনুসরণ:** এই পর্যায়টির একটি বিশেষত্ব হল, কিশোর-কিশোরী তার সাহসী, শক্তিশালী, বুদ্ধিমান সহপাঠীদের অত্যধিক প্রশংসা করে, যারা খেলাধুলা ও পড়াশোনায় অনেক ভাল। এর মানে হল, সে অগ্রগতি ও শ্রেষ্ঠত্বের দিকে ঝুঁকছে এবং বিভিন্ন উপায়ে এটিকে অর্জন করার চেষ্টা করছে। তাই তার জন্য এমন নির্দেশনা প্রয়োজন যা তাকে তার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। অন্যথায়, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাটি এমন কিছুর দিকে পরিচালিত হতে পারে যা উপকারহীন। যেমন গায়ক, খেলোয়াড় বা এদের মতো কারো অনুকরণ করা। অথবা বেঠিক উপায়ে তা অর্জনে করতে বিচ্যুত হতে পারে, যেমন মিথ্যার উপর নির্ভর করা, অহংকার ও গর্ব প্রকাশ করা এবং অন্যের সামনে ভাইরাল হতে, বিশেষ করে তার সমবয়সীদের সামনে শক্তি ব্যবহার করা।

- **সমালোচনা করার প্রবণতা ও সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা:** এই পর্যায়ে নানাবিধ বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতনতা ও উপলব্ধি বৃদ্ধি পায়। সাধারণ বিকাশের সাথে সঙ্গতি রেখে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, সামাজিক আচরণ নিয়ে তার সমালোচনা এবং তা সংস্কারের আকাঙ্ক্ষার অনুভূতি বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা এমনটাই উল্লেখ করেছেন, তাদের মতে সামাজিক সচেতনতা, সমালোচনার প্রবণতা, সমাজ সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা এবং যুগান্তকারী উপায়ে নানা অবস্থার পরিবর্তন করার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়- বড়দের ন্যায় অধ্যয়ন, ধীরে ধীরে ও ধৈর্যের সাথে সম্পাদন করা ছাড়াই। এ কারণেই প্রজ্ঞা ও সতর্কতার সাথে বিষয়গুলো মোকাবেলা করার লক্ষ্যে বিচক্ষণতা অর্জনে তাকে নির্দেশনা প্রদান ও সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়।

- **মানসিক বিকাশ:** এ পর্যায়টির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, এ সময়ে প্রচুর আবেগ কাজ কের যা তাদের উদ্দীপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সেই সাথে এটা কিশোর-কিশোরীর মানসিক অস্থিরতা, আচরণগত পরিবর্তন এবং পছন্দ ও ঘৃণা, সাহস ও ভয়, প্রফুল্লতা ও বিষণ্ণতা এবং উদ্দীপনা ও উদাসীনতার মাঝে তার দোদুল্যমানতা দ্বারা চিহ্নিত হয়। তার মাঝে লাজুকতাও লক্ষ্য করা যায়। এসব বাহ্যিক মানসিক বিষয়সমূহ অন্যদের সাথে তার নৈতিকতা ও আচরণের উপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলে। উদাহরণস্বরূপ লজ্জা, এটা যদি ভুল ক্ষেত্রে হয়, তাহলে তা ভুল করার ভয়ে ও অন্যের সমালোচনার আশঙ্কায় তার সৎ পথে চলাকে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে। এটি তাকে সংকুচিত করে দিতে পারে। বরং, পছন্দ ও ঘৃণা এবং উদ্যমতা ও উদাসীনতার মধ্যে তার দ্বিধা তাকে বিভিন্ন বিষয়ের সংকল্প হতে দূরে রাখতে পারে এবং তাকে দ্বিধাগ্রস্ত করতে পারে।

- **দিবাস্বপ্ন:** কিশোর কখনও কখনও তার অলীক কল্পনা দিয়ে তার সক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে। এ কল্পনায় সে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতিগুলি আঁকে এবং তাতে সমস্যাগুলোর সমাধান করে। সে নিজের জন্য এমন চিত্রও অঙ্কন করে যা বাস্তবসম্মত

হতে পারে, যেমন সে একজন শিক্ষক বা কর্মকর্তা অথবা একজন দ্বীনের প্রচারক হবে। অথবা সে নিজের জন্য এমন চিত্র আঁকে যা সে অর্জন করতে সক্ষম নয়। কখনো কখনো তাকে এই কল্পনা নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে অবৈধ উপায়ে তার ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য যা সে কল্পনা করেছে। আর এখানেই কিশোরকে পথ দেখাতে এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সামর্থ্যকে দিকনির্দেশনা, উপদেশ ও উত্তম নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয় করতে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সামনে আসে।

- **সামাজিক টান:** এই পর্যায়ে সে যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের প্রতি তার ঝোঁক বৃদ্ধি পায় এবং এর সদস্যদের মধ্যে সে বন্ধুদের একটি দল গঠন করে যাদের সে অন্তর্গত; সে তাদেরকে প্রভাবিত করে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে, ((এই পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীর বেড়ে উঠা ও স্বাভাব-প্রকৃতি গঠন প্রক্রিয়ায় সঙ্গ অথবা বন্ধু-বান্ধব ও সহপাঠীর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং বড়দের অনুকরণের চেয়ে বেশি তাদেরকেই অনুকরণ করে।))[১]

কাজেই যদি সঙ্গী-সাথীরা উত্তম শিষ্টাচার ও নৈতিক ভাল গুণাবলী সম্পন্ন হয়, তবে এটার প্রভাব তাদের সাথে যারা উঠাবসা করে তাদের উপর প্রতিফলিত হয় এবং তাদের আচার-আচরণে প্রকাশ পায়।

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা:

১- যৌন ক্রিয়াকলাপ: যৌন ক্রিয়া মানুষের সহজাত ক্রিয়াকলাপের একটি যা জনসংখ্যার বৃদ্ধি, প্রজনন ও তাদের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন। ইসলাম এই ক্রিয়াকলাপের জন্য এমন নির্দেশনা প্রদান করেছে যা প্রাপ্তবয়স্কদের উত্তম চরিত্র সুনিশ্চিত করে, তাকে

---

(১) দেখুন: ইলমুন নাফস: পৃঃ৩২৬।

পাপ-অশ্লীলতার ফাঁদ ও বেড়াজাল থেকে দূরে রাখে। তাই এমন প্রতিটি দরজা বন্ধ করেছে যা যৌন আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলে, যেমন হারাম দৃষ্টিপাত বা বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাত, যেখানে শয়তান তাদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে। এ মর্মে রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**কোন পুরুষ যেন অপর কোন মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী হজ্জ করার জন্য বেরিয়ে গেছে, আর অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, বরং তুমি যাও, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর**’।)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম নববী রহঃ বলেন: ((তবে যদি কোন বেগানা পুরুষ কোন বেগানা মহিলার সাথে তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপস্থিতি ছাড়া নির্জনে একত্রিত হয়, তবে তা আলেমদের ঐক্যমতে হারাম। অনুরূপভাবে তাদের সাথে এমন কেউ থাকলে যে অল্প বয়সী হওয়ার কারণে তার সাথে লজ্জাবোধ করে না, যেমন দুই বা তিন বছরের বাচ্চা বা তার অনুরূপ, তাহলে তার উপস্থিতি অনুপস্থিতির মতই। অনুরূপভাবে, কোন পুরুষ যদি কোন বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত হয়, তবে তা হারাম।))[১] নবী সাঃ বলেছেন: ((**সাবধান! কোন পুরুষ কোন বিবাহিত নারীর কাছে কিছুতেই রাত যাপন করবে না; তবে যদি সে তার স্বামী হয় অথবা মুহরিম হয়**।)) সহীহ মুসলিম। আলেমগণ বলেছেন যে, এখানে তিনি বিবাহিতা নারীকে নির্দিষ্ট করে বলেছেন, কারণ প্রায়শই এদের নিকটই পুরুষরা প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে কুমারী মেয়ে, সাধারণত প্রথাগতভাবেই তার সুরক্ষিত এবং পুরুষদের থেকে অধিক বিচ্ছিন্ন থাকে, তাই তার উল্লেখ করার দরকার নেই। তাছাড়া এটি একটি সতর্কবাণী, কারণ যদি বিবাহিতার নিকট গমন করা হারাম হয় যা মানুষ সাধারণত সাধারণ মনে করে থাকে, তবে কুমারীর নিকট গমন করা আরো যৌক্তিকভাবে নিষিদ্ধ।

---

(১) শরহু সহীহ মুসলিম: ১৪/১৫৩।

অনুরুপভাবে ইসলাম ফেতনা এড়াতে স্ত্রীর সাথে নির্জনে থাকার বিরুদ্ধে স্বামীর আত্মীয়দেরকেও সতর্ক করেছে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**সাবধান! মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাক। জনৈক আনসার জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দেবরদের ব্যাপারে কি নির্দেশ? তিনি উত্তর দিলেন, দেবর তো মৃত্যুতুল্য**।)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

অনুরুপভাবে ইসলাম নারীদেরকে হিজাব পরিধান করার নির্দেশ দেয় যাতে তারা পুরুষদের উত্তেজিত না করে এবং যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে তারা তাদের প্রতি লোলুপ না হয়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ [النور: ٣١]

অর্থ: [আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে।] সূরা আন-নূর: ৩১। তিনি আরো বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩﴾ [الأحزاب: ٥٩]

অর্থ: [হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।] সূরা আল-আহযাব: ৫৯।

"এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চেহারা ঢেকে রাখা; ওড়না বা নিকাব দিয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে।"[১] যাতে একজন মুসলিম উন্নত চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে থাকতে পারে, তাই ইসলাম তাকে চক্ষু অবনত রাখতে নির্দেশ দেয় যেন সে ঐসব যৌন উত্তেজিতকারী প্ররোচনা দেখতে না পায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠﴾ [النور: ٣٠]

অর্থ: [মুমিন পুরুষদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে; এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।] সূরা আন-নূর: ৩০।

চক্ষু অবনত রাখা রাস্তারও একটি হক, যেমনটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে, রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তিনি বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জওয়াব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।**))

ইসলাম একজন নারীকে সুগন্ধি ব্যবহার করে পুরুষদের মাঝে বের হতে নিষেধ করেছে; যাতে তারা তার সুঘ্রাণে এমন কিছু খুঁজে না পায় যা তাদেরকে প্রলুব্ধ করবে বা তাদের কামনা জাগিয়ে তুলবে। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**যে মহিলা সুগন্ধি লাগিয়ে এই উদ্দেশ্যে লোকের মধ্যে গমন করে যে, তারা তার সুগন্ধির ঘ্রাণ পাবে, সে ব্যাভিচারিণী।**)) সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযি ও নাসায়ী।

---

(১) আবুল আ'লা মাওদুদীর 'আল হিজাব': পৃ: ৩২২।

যদি এই নির্দেশাবলী কিশোর, কিশোরী ও যুবকরা মেনে চলে, তবে এর প্রভাব যৌন ক্রিয়াকলাপ পরিমার্জিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের আচরণে প্রতিফলিত হবে।

২- অনুকরণের প্রবণতা এবং প্রতিযোগিতার প্রতি আগ্রহ: ইসলাম এ উম্মতকে আল্লাহর রাসূল সাঃ-কে অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ, তিনিই সর্বোচ্চ নৈতিকতা এবং উত্তম আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١﴾ [الأحزاب: ٢١]

অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে বেশী স্মরণ করে।] সূরা আল-আহযাব: ২১।

এই মহৎ আয়াতটি কথায়, কাজে ও সর্বাবস্থায় রাসূল সাঃ-কে অনুসরণ করার একটি বড় ভিত্তি। এই কারণে মহান আল্লাহ মানুষকে ধৈর্য, অধ্যবসায়, অবিচলতা ও সংগ্রামের মাধ্যমে আহযাবের দিনে নবী সাঃ-কে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার প্রভুর পক্ষ থেকে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তার জীবনী সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে সম্মানজনক আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ এটি সাহস, ধৈর্য, অধ্যবসায়, জিহাদ ও আনুগত্যের মতো বীরত্বপূর্ণ নৈতিকতা দেখায়। এটি নবীজীর জীবনের বাস্তব প্রয়োগ। নবী-রাসূলদের জীবনী অধ্যয়ন করার সময় তরুণরাও একটি ভালো আদর্শ ও উদাহরণ খুঁজে পেতে পারে, যদি তারা অনুসরণ করতে চায়। মহান আল্লাহ তো বলেছেন:

﴿لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِيهِمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ٦﴾ [الممتحنة: ٦]

অর্থ: [নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।] সূরা আল-মুমতাহিনা: ৬।

কিশোর-কিশোরীদের জীবনে পিতামাতা ও শিক্ষকের প্রধান ভূমিকা রয়েছে। কারণ, তারা তাদের জন্য আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হয়; তারা দিনরাত তাদের উপর নজর রাখে, সুখ ও দুঃখের সময়ে, ভাল-মন্দ, উপকারী ও ক্ষতিকর সব পরিস্থিতিতে। অতএব তাদেরকে অবশ্যই স্কুলে, বাড়িতে এবং রাস্তায় উত্তম আদর্শ হতে হবে, তাদের মাঝে ইসলামী নৈতিকতা প্রতিফলিত হতে হবে যার প্রতি ইসলামী শিক্ষা কারিকুলাম উদ্বুদ্ধ করেছে।

৩- সমালোচনা করার প্রবণতা এবং সংস্কারের আকাঙ্ক্ষা: যখন একজন ব্যক্তি এই পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন সে অন্যদের সংস্কারে অবদান রাখতে আগ্রহী হয়। ফলে ইসলামী শরীয়ত পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ও করুণাময়ের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সুস্পষ্ট নির্দেশনায় তাকে সমর্থন করে ও উৎসাহিত করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ﴾ [آل عمران: ١٠٤]

অর্থ: [আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল যেন থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর তারাই সফলকাম।] সূরা আলে ইমরান: ১০৪। তাছাড়া রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমাদের মধ্যে যে মন্দ দেখতে পায়, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে, যদি তার সামর্থ্য না থাকে তবে জিহ্বা দ্বারা, যদি সে সক্ষম না হয় তবে তার অন্তর দিয়ে, এবং এটাই ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।**)) সহীহ মুসলিম। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাঃ যা নিয়ে এসেছেন তা

অনুসরণ করে না এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে না, সে সমাজের সদস্যদের কাছ থেকে তাকে সমালোচনা করার জন্য এবং তাকে উপদেশ ও নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কাউকে পেয়ে যাবে। বিশেষ করে যদি সমাজে সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি পায়।

কাজেই এই ইসলামী নির্দেশনা, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে মানানসই এবং তাকে তার কর্তব্য ও পুরুষত্ব অনুভব করায়; এ জন্য প্রশিক্ষণ, নির্দেশনা ও শিক্ষার প্রয়োজন, যতক্ষণ না সে এতে অভ্যস্ত হয় ও তা অনুশীলন করে। এখানেই তরুণদের শিক্ষিত করতে এবং তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বিষয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পরিবার, স্কুল, মিডিয়া ও মসজিদের ভূমিকা সামনে চলে আসে।

৪- মানসিক বিকাশ: কিশোর তার শৈশব পর্যায় থেকে আরও পরিণত পর্যায়ে চলে যায়, যা তাকে যৌবনের জন্য প্রস্তুত হতে প্রস্তুত করে। তার ভালবাসা ও ঘৃণা, সাহস ও ভয়, প্রফুল্লতা ও বিষণ্ণতার মধ্যে থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার, যাতে সে নির্দেশনা, উত্তম নৈতিকতা ও পরার্থপরতার জন্য এবং এগুলোর প্রতি তার আগ্রহ ও তা বাস্তবয়নে সদিচ্ছায় একটি সহজ বিল্ডিং ব্লক হয়ে উঠতে পারে। এবং যাতে সে অসৎকাজকে ঘৃণা করে, এগুলোকে ভয় করে এবং যখন এর কোনটি তার দ্বারা ঘটে তখন বিষণ্ণ হয়। তাই, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা, সাহস, উদারতা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ থেকে নিষেধের মতো নৈতিক গুণাবলীর প্রতি কিশোর-কিশোরীর আবেগকে প্ররোচিত করা সহজ। কুরআনের আয়াত ও নবীর হাদিস এবং সৎকাজে উৎসাহিতকারী সাহাবায়ে কেরামের জীবনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে তা পরিমার্জিত করা যেতে পারে। অন্যদিকে, তার আবেগ মন্দকে ঘৃণা ও ভয়ের দিকে উদ্বুদ্ধ হয় এবং আল্লাহর শাস্তিকে স্মরণ করে; যাতে সে মিথ্যা, গীবত, পরচর্চা, বিশ্বাসঘাতকতা, কাপুরুষতা, অশ্লীলতা এবং অন্যান্য খারাপ কাজগুলি এড়িয়ে চলতে পারে।

যেহেতু এই পর্যায়টিতে লাজুকতা দেখা দেয়, যা তার নৈতিক সংকল্পকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং যদি এটি যথাস্থানে না হয় তবে তা বিনষ্ট হতে পারে; তাই তাকে এ নির্দেশনা দিতে হবে যে, সে কেবল আল্লাহর সামনেই লজ্জা করবে গোপনে ও প্রকাশ্যে। কারণ এটি ঈমানের একটি শাখা, যেমন নবী সাঃ বলেছেন: ((**ঈমানের সত্তরটি শাখা রয়েছে, যার মধ্যে সর্বোত্তমটি হল, এ কথা বলা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, এবং সর্বনিম্নটি হল পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর লজ্জা হল ঈমানের একটি শাখা।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। তেমনিভাবে কিশোরকে এমন পরিস্থিতিতে লজ্জাবোধ না করতে নির্দেশনা দিতে হবে যেখানে লজ্জা করা নিন্দনীয়, যেমন সত্য বলা, শেখা ও উপদেশ দেওয়া।

৫- সামাজিক টান: মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক, সে মানুষের সঙ্গ পছন্দ করে এবং একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা অপছন্দ করে। তবে এই বৈশিষ্ট্যটি আগেরটির তুলনায় এই পর্যায়ে বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম এই প্রবণতাকে আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্বের প্রতি নির্দেশ করেছে। ঈমানী এই সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব, যা একটি পরিবার বা জাতি যখন এতে আবদ্ধ হয়, তখন একটি গভীর সামাজিক বিপ্লব তৈরি করে, যার প্রভাব ও ফলাফল সুদূরপ্রসারী। তাই আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে পরস্পর সহানুভূতিশীল ভাই ভাই বানিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا﴾ [آل عمران: ١٠٣]

অর্থ: [আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে।] সূরা আলে ইমরান: ১০৩।

ব্যবহারিক শিক্ষা:

এই পর্যায়ের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা নিম্নরূপ:

- এই পর্যায়ের তরুণদেরকে তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে পরিচালিত করতে পরিবার ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ভূমিকা রয়েছে। কারণ এরা কল্যাণ, সংযমতা এবং বিশৃঙ্খলা এড়িয়ে চলার দিকে নির্দেশনা গ্রহণে ও তা মানিয়ে নেয়ার জন্য যোগ্য বিল্ডিং ব্লক। যা এর দিকে পরিচালিত করতে পারে তা হল:
- এই পর্যায়ে, ব্যক্তিদেরকে তাদের ভাইদের সাথে সহযোগিতা এবং সামাজিক সংহতির জন্য এমনভাবে নির্দেশিত করা উচিত যা তাদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম ও কার্যকলাপের আলোকে মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করে।
- তাদেরকে চারিত্রিক বিচ্যুতি ও ত্রুটিগুলো ব্যাখ্যা করা যা এড়ানো উচিত, আর যারা সেগুলোতে জড়িত হয় তাদেরকে সতর্ক করা। সেই সাথে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার মাধ্যমে তাদের উক্ত বিষয় সংশোধনে তাদের ভূমিকা প্রকাশ করা।
- নবীর জীবনী এবং সাহাবী ও ধার্মিক মুসলমানদের জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামী বীরত্ব তুলে ধরা যাতে তারা তাদেরকে অনুকরণ করে। গায়ক, অভিনেতা এবং অন্যান্যদের মতো বিপথগামীদের অনুকরণ করার পরিবর্তে যারা সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির যথাযথ শিক্ষাগত ভূমিকায় অবহেলার কারণে কিছু ছেলে ও মেয়েদের জন্য রোল মডেল হয়ে উঠেছে। কারণ, পরিবারের ভূমিকা শুধুমাত্র

শারীরিক পুষ্টি প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর মধ্যে রয়েছে মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টি, যা একসাথে নৈতিক ভিত্তি গঠন করে।

- শিক্ষাগত দিকনির্দেশনাগুলো একজন ব্যক্তির জীবনের এই পর্যায়ে থেমে থাকে না, বরং তার যৌবন ও বার্ধক্যকাল পর্যন্তও চলতে থাকে, যা নিম্নলিখিত দুটি পর্যায় থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

পঞ্চমত: যৌবনকাল (পরিপক্কতা অর্জনের পর্যায়)

এই পর্যায়টি জ্ঞানগত, শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতার প্রতিনিধিত্ব করে। এটা অবদান রাখা এবং আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতার পর্যায়। এটাকে (الرشد) বিচারবোধ, (الأشد) শক্তি সামর্থ্য ও (الشباب) যৌবনের পর্যায় বলা হয়। এটাকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে:

(الرشد) বিচারবোধ, (الأشد) শক্তি সামর্থ্য ও (الشباب) যৌবন সম্পর্কে ধারণা:

(الرشد) বিচারবোধ: এর মানে হল সত্যকে অবলম্বন করে তার উপর অবিচল থাকা। এটা ভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতির বিপরীত। এটা পরিপক্কতা ও উপযুক্ততাকে অন্তর্ভুক্ত করে।[১] মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ [النساء: ٦]

অর্থ: [আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ না তারা বিয়ের যোগ্য হয়। অতঃপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্কতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও।] সূরা আন-নিসা: ৬।

সাঈদ বিন জুবায়ের রহঃ বলেন: এর অর্থ তাদের দ্বীন পালনে ও অর্থ-সম্পদ সংরক্ষণে উপযুক্ত হওয়া। এমনটি ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী ও একাধিক ইমামের কাছ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপ ফকীহগণও বলেছেন। "যদি ছেলেটি তার দ্বীন ও তার বিষয়-সম্পদ সংরক্ষণের যোগ্যতায় উপনীত হয়, তবে তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং তার অভিভাবকের হাতে থাকা সম্পদ তার হাতে তুলে দিতে হবে।[২]"

---

(১) দেখুন: আল-কামূস আল-মুহীত: ১/২৯৪।

(২) দেখুন: তাফসীর ইবনে কাসীর: ১/৪৬৩।

(الأشد) শক্তি সামর্থ্য: এর মানে হল পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া। এটা আঠারো থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে। তবে ইমাম যুজাজ রহঃ বলেন: "এটা সতেরো থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে।" কেউ কেউ এটাকে ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[১] চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করার মাধ্যমে এ স্তরের পূর্ণতা পায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيۡهِ إِحۡسَٰنًاۖ حَمَلَتۡهُ أُمُّهُۥ كُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرۡبَعِينَ سَنَةٗ قَالَ رَبِّ أَوۡزِعۡنِيٓ أَنۡ أَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتَ عَلَيَّ﴾ [الأحقاف: ١٥]

অর্থ: [অবশেষে যখন সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, হে আমার রব! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য।] সূরা আল-আহকাফ: ১৫।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন: [যখন সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয়], অর্থাৎ শক্তি, বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার ক্ষমতার পূর্ণতায় পৌঁছে। আর এর সর্বনিম্ন হল তেত্রিশ বা ত্রিশ বছর, আর চল্লিশ বছর হল এর পূর্ণতা, আর এটাই এ স্তরের সর্বোচ্চ সীমা।[২]

ইবনে আব্বাস রাঃ-এর মতে, (الأشد) মানে বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা। এ মতটি ইয়াহয়া ইবনে ইয়ামার ও সুদ্দি রহঃ-এর পছন্দ। মুজাহিদ রহঃ-এর মতে: এর বয়স ছত্রিশ বছর। ইমাম যাহহাক এর মতে বিশ বছর, আর মুকাতিল রহঃ বলেছেন: আঠারো বছর। আর ইমাম যুহুরী রহঃ এটার শাব্দিক বিশ্লেষণ করে বলেন: (الأشد) এ পৌঁছা মানে বক্তির যৌবনে পদার্পণে করে চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া। ফলে এ স্তরটির সূচনা

---

(১) দেখুন: আল-কামূস আল-মুহীত: ১/৩০৫, এবং লিসানুল আরব: ৩/২৩৫।

(২) দেখুন: তাফসীরে জালালাইন: পৃ: ৬৬৮।

সুনির্দিষ্ট, তবে সমাপ্তি চল্লিশের আগ পর্যন্ত অনির্দিষ্ট; অর্থাৎ এটা বয়োপ্রাপ্তির সূচনা থেকে চল্লিশের মাঝে।[১]

(الرشد) বিচারবোধ এবং (الأشد) শক্তি সামর্থ্য উভয়টি অর্থ ও লক্ষ্যের দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত। কারণ, আমরা দেখতে পাই যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ এতিমকে তার অর্থ-সম্পদ তার হাতে তুলে দেয়া কখনও কখনও বিবাহের সক্ষমতা ও বিচারবোধ অর্জনের সাথে এবং কখনও কখনও শক্তি সামর্থ্য অর্জনের সাথে সংযুক্ত করেছেন। সূরা আল-আনআমে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ﴾ [الأنعام: ١٥٢]

অর্থ: [আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া, যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়।] সূরা আল-আনআম: ১৫২।

ইমাম কুরতূবী রহঃ বলেন: অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয়। এটা কখনো শারীরিক শক্তিমত্তা আবার কখনো অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞান হতে পারে। এক্ষেত্রে উভয়টির সমন্বয় হওয়া জরুরী। কেননা এখানে আমভাবে পূর্ণ শক্তির কথা বলা হয়েছে। সূরা নিসায় বৈশিষ্ট্যসহ ইয়াতীমের অবস্থা বর্ণিতে হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ﴾ [النساء: ٦]

অর্থ: [আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ না তারা বিয়ের যোগ্য হয়। অতঃপর যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্কতা দেখতে পাও, তবে তাদের

(১) দেখুন: তুহফাতুল মাওদূদ: পৃ: ১৭৮।

ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও।] সূরা আন-নিসা: ৬। এ আয়াতে শারীরিক শক্তিমত্তা তথা বয়োপ্রাপ্তি এবং জ্ঞানগত শক্তি তথা বিচক্ষণতার সমন্বয় করা হয়েছে।[১]

অতএব এটা নির্দেশ করে যে, (الأشد) শক্তি সামর্থ্য হল শারীরিক ও জ্ঞানগত শক্তি। আর (الرشد) বিচারবোধ হল জ্ঞানগত শক্তি এবং (البلوغ) বয়োপ্রাপ্তি হল শারীরিক শক্তি। ফলে (الرشد) তথা বিচারবোধটি (الأشد) শক্তি সামর্থ্য-এর একটি অংশ। এর অর্থ হল (الرشد) বিচারবোধ ও (الأشد) শক্তি সামর্থ্য এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় নয়, বরং একই পর্যায়।

এই পর্যায়ের শুরু ও শেষ সময়কাল নির্ধারণের বিষয়ে আমি যা বেছে নিয়েছি তা হল, সর্বনিম্ন সতেরো এবং সর্বোচ্চ চল্লিশ বছর, নিম্নোক্ত কারণে:

১- সূরা আল-আনআম এবং আন-নিসার দুটি আয়াত এ দিকেই নির্দেশ করে।

২- সূরা আল-আহকাফের আয়াতটি নির্দেশ করে যে, (الأشد) তথা শক্তি সামর্থ্য-এর পূর্ণতম সময়কাল হল চল্লিশ বছর।

৩- আরবি ভাষার অভিধানগুলি যা নির্দেশ করে তা হল সর্বনিম্ন সতেরো বছর এবং সর্বোচ্চ চল্লিশ বছর। ইবনে মানযুর ইমাম যুজাজ রহঃ থেকে এমনই উল্লেখ করেছেন।

৪- (الأشد) শক্তি সামর্থ্য-এর অর্থ হল শারীরিক ও জ্ঞানগত পূর্ণ শক্তি, এবং সঠিক মতামত ক্ষমতা, যেমনটি ইমাম কুরতুবি ও জালালুদ্দীন সুয়ুতি উল্লেখ করেছেন। এটি কেবল তাদের ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে যারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি এবং বয়োপ্রাপ্তির

---

(১) দেখুন: আল জামে' লি-আহকামিল কুরআন: ৭/৭৮।

বয়স পেরিয়ে গেছে। আর যা বিরল, তাতে কিছু যায় আসে না। এছাড়াও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি তার শক্তি সম্পূর্ণ করেই চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছায়।

৫- আলেমদের দ্বারা উল্লিখিত সর্বনিম্ন পরিমাণ সতেরো বছর এবং সর্বোচ্চ চল্লিশ বছর।

(الشباب) যৌবন: ইবনে মানযুর বলেন: ((যৌবন হল তারুণ্য ও নবীনতা।[১])) ইমাম নববীর মতে: ((যে বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু ত্রিশ বছর অতিক্রম করেনি।[২]))

শাফেয়ী মতালম্বীদের মতে, এটা এমন ব্যক্তিকে বলে যার বয়স ত্রিশে পৌঁছেছে। ইমাম কুরতুবী বলেন: বলা হয়ে থাকে যে, ষোল বছরে বয়োপ্রাপ্ত হয়, তারপর বত্রিশ বছরে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে, তারপর প্রৌঢ় হয়। ইমাম যামাখশারীও এমনটি উল্লেখ করে বলেন: যৌবন হল বালেগ হওয়ার পর থেকে বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত। ইবনে শাম্মাছ মালেকীর মতে চল্লিশ পর্যন্ত।

এর অর্থ হল (الشباب) তথা যৌবন-এর স্তরটি (الرشد) বিচারবোধ স্তরের আওতাভুক্ত, যেহেতু এটা তেত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, (الرشد) বিচারবোধ, (الأشد) শক্তি সামর্থ্য ও (الشباب) যৌবন- এগুলো সবই একই পর্যায়ভুক্ত, ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় নয়।

যৌবনকালের বৈশিষ্ট্যাবলী:

প্রাণবন্ততা: এই পর্যায়টির বৈশিষ্ট্য হল যে, এই সময়ে ব্যক্তির উৎপাদন ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে এবং সে সম্পূর্ণ পরিপক্কতায় পৌঁছে। এই পর্যায়টিকে সত্যিকার অর্থে

---

(১) দেখুন: লিসানুল আরব: ১/৪৮০।

(২) দেখুন: শরহু সহীহ মুসলিম: ৯/১৭৩।

দান, প্রতিযোগিতা ও জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই এর জন্য নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রয়োজন যা এই প্রদান ও প্রতিযোগিতাকে পরিমার্জিত করে এবং এটাকে কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে।

অনুরূপভাবে তার মানসিক ক্ষমতাও শেখা ও বোঝার জন্য আরও বেশি সক্ষম হয়ে ওঠে। এটি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে যতক্ষণ না এটা তার যৌবনকালে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায়। আর এটা তার আচরণ ও নৈতিক গুণাবলী সম্পর্কে সচেতনতার উপর প্রতিফলিত হয়।

মানসিক ক্ষমতা: কিছু গবেষণা ইঙ্গিত দেয় যে, পরিপূর্ণ যুবকদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার মাত্রা এই পর্যায়ে স্থিতিশীল থাকে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জ্ঞানগত দিক সহ অনেক হেতুর কারণে একটি আপেক্ষিক পরিবর্তন হয়। ফলে একজন যুবক যত বেশি শিক্ষিত, তিনি বিশ্লেষণ ও অনুমানে তত বেশি শক্তিশালী এবং পরিণতি সম্পর্কে তত বেশি সতর্ক থাকেন। এটি তার আচরণেও প্রতিফলিত হয়। সামাজিক পরিবেশ যত বেশি শিক্ষিত, বোঝদার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, প্রাপ্তবয়স্কদের চিন্তাভাবনায় এটি তত বেশি প্রতিফলিত হয়।

আবেগ: যৌবনের পর্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, যুবকের আচার-আচরণ শৈশবকালে তাকে বিরক্তকরী সবচেয়ে ভয়ের বিষয়গুলো থেকে রেহায় দেয় এবং এটা তার নৈতিক ভয়ে পরিবর্তিত হয়। কারণ, এ সময় ব্যক্তি ব্যর্থতার আশঙ্কা করে এবং সামাজিক অবস্থান বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে। তাই এই পর্যায়ে "উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শন" সংক্রান্ত শিক্ষার গুরুত্ব সামনে আসে; যাতে একজন যুবক মানুষের ভয়ের আগে আল্লাহর ভয় নিয়ে বেড়ে উঠে ও আল্লাহকে লজ্জা করে চলে এবং মানুষের নিকট অপদস্ত হওয়ার আশঙ্কা করার আগে হাশরের দিনে সকলের সামনে বেইজ্জতির আশঙ্কা করে।

আর মানসিক আবেগের ক্ষেত্রে, এটা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের আবেগে পরিণত হয় এবং এই আবেগটি পূর্ণ যৌবনকালে তীব্রতায় পৌঁছে। বিবাহ সম্বন্ধে তার দৃষ্টিভঙ্গি আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক হয়ে ওঠে। কারণ এটার লক্ষ্য যৌন চাহিদাকে মেটানোর পাশাপাশি পিতৃত্ব, মাতৃত্ব এবং পরিবার সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা।

শেখার আগ্রহ: যুবকদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল শেখার আগ্রহ। প্রত্যেকেরই অর্জন ও পুরস্কৃত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব, এমনকি এও অনুভব করা যে, সে তার কাজটি প্রত্যাশা অনুযায়ী সম্পাদন করছে।[১]

এই পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী হল:[২]

১ - ভবিষ্যত সম্পর্কে অধিক চিন্তাভাবনা এবং শিক্ষাগত ও পেশাদারী দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২- অর্থ উপার্জনের ঝোঁক।

৩- সমাজের চাহিদা অনুধাবন করার পর সমাজ সংস্কার ও জনসেবা প্রকল্পে অংশগ্রহণ প্রবণতা।

৪- বই পড়া এবং দুঃসাহসিক কাজের ঝোঁক।

৫- অবসর সময় সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা।

এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ইসলামী নির্দেশনার আলোকে নিম্ন পদ্ধতীতে সঠিকভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে:

১- তাকে পরকালীন সওয়াবের প্রতি এবং দুনিয়াতে তার অংশ ভুলে না যেতে উৎসাহিত করা।

---

(১) দেখুন: নুমু' আল-ইনসান: পৃ: ৩০৯।

(২) দেখুন: ইলমুন নাফস আর-রিয়াদী: পৃ: ১৫১-১৫২।

২- আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তার আলোকে অর্থ উপার্জনের পথ ঠিক করা এবং অবৈধ উপার্জনের বিরুদ্ধে সতর্ক করা।

৩- তার সমাজ সংস্কারের আকাঙ্খাকে এসবের আলোকে নির্দেশ করা: ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ, অপর ভাইদের সাহায্য করা এবং তার কাজ যেন নিষ্ঠার সাথে কেবল আল্লাহর জন্য হয় সেই লক্ষ্যে নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা।

৪- তাকে উপযোগী বই পড়তে উৎসাহিত করা, যেমন বিশুদ্ধ আক্বীদা, ফিকহ এবং তার পেশার সাথে সম্পর্কিত বই ও অন্যান্য দরকারী বই।

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা:

এই পর্যায়টি যৌবন এবং যৌন, মানসিক ও শারীরিক পরিপক্কতার পর্যায়। এটা এমন একটি পর্যায় যেখানে যুবকরা প্রায়শই বিয়ে করতে সক্ষম হয়, যা দৃষ্টি অবনত রাখার ও অনৈতিকতায় জড়িত হওয়া থেকে সতীত্ব হেফাযতের জন্য অধিক নিরাপদ। নবী সাঃ সেসব যুবকদেরকে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন যাদের বিয়ের সক্ষমতা আছে। এ মর্মে তিনি বলেছেন: ((**হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য**[১] **রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। কেননা, সওম তার যৌনতাকে দমনকারী।**[২])) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

তা ছাড়াও বিবাহ যৌন ও পিতৃত্বের আগ্রহকে সন্তুষ্ট করে। কেননা এটি দৈহিক প্রশান্তি ও স্বস্তিদায়ক। মহান আল্লাহ বলেন:

---

(১) এটার ব্যাখ্যায় দুটি মত পাওয়া যায়: এক. শারীরিক সক্ষমতা, অর্থাৎ যার স্ত্রী সহবাসের ক্ষমতা রয়েছে সে যেন বিয়ে করে। এ মতটি অধিক বিশুদ্ধ। দুই. স্ত্রীর ভরণপোষন দেয়ার সক্ষমতা। দেখুন: শরহু সহীহ মুসলিম: ৬/১৭৩।

(২) অর্থাৎ সিয়াম মিলন ইচ্ছাকে দমিয়ে দেয়। দেখুন: আন-নিহায়া: ৫/১৫২।

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَجَعَلَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا لِيَسۡكُنَ إِلَيۡهَاۖ﴾ [الأعراف: ١٨٩]

অর্থ: [তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার স্ত্রীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে।] সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৯। তিনি আরো বলেন:

﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: ٢١]

অর্থ: [আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের স্ত্রীদের; যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সহমর্মিতা। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।] সূরা আর-রূম: ২১। ফলে এ সম্পর্কটি আত্মা ও স্নায়ুর জন্য প্রশান্তি, শরীর ও হৃদয়ের জন্য আরাম এবং জীবন ও জীবিকার জন্য স্থিতিশীলতা তৈরি করেছে।[১] এটা তাকে মেজাজে শান্ত এবং মানসিকভাবে স্থিতিশীল করেছে এবং নিঃসন্দেহে এটা ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ ও আচরণে ইতিবাচকভাবে প্রতিফলিত হয়।

নারী ও পুরুষের চরিত্রের উপর খারাপ প্রভাবের কারণে ইসলাম নিন্দনীয় কাজকেও নিষিদ্ধ করেছে। রাসূল সাঃ বলেছেন: **((দু প্রকার জাহান্নামী লোক হবে যাদেরকে আমি দেখিনি। এক প্রকার ঐ সব লোক যাদের কাছে গরুর লেজের ন্যায় ছড়ি থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকেদের পিটাবে। দ্বিতীয় প্রকার ঐ শ্রেণীর মহিলা, যারা কাপড় তো পরিধান**

(১) দেখুন: সাইয়্যেদ কুতুব রচিত 'ফি যিলালিল কুরআন': ৫/২৭৬৩।

করবে, কিন্তু তারা বস্তুতঃ উলঙ্গ থাকবে,[১] **তারা পুরুষদের আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, তাদের মস্তক (খোঁপা বাঁধার কারণে) উটের হেলে যাওয়া কুঁজের মত হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি অনেক দূর থেকে পাওয়া যায়।))** সহীহ মুসলিম। ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **((নবী সাঃ নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষের উপর এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী মহিলাদের উপর লানত করেছেন। তিনি বলেছেন, ওদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও। ইবনে আব্বাস রা) বলেন, নবী সাঃ অমুককে বের করেছেন এবং উমর রাঃ অমুককে বের করে দিয়েছেন।))** সহীহ বুখারী।

অনুরূপভাবে ইসলাম একজন মুসলমানের মধ্যে সংযমতার নৈতিকতাও শিক্ষা দেয় এবং সে যেন তার যৌবন, পরিপক্কতা ও পরিণত পর্যায়ে থাকাবস্থায় মানুষের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি না করে। কেননা সে এ অবস্থায় উপর্জন ও প্রদানে অধিক সক্ষম থাকে- চাওয়া, চাঁদাবাজি ও মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করার লাঞ্ছনার পরিবর্তে; তারা হয়ত তাকে দিবে অথবা মানা করবে। নবী সাঃ বলেছেন: **((কোন ব্যক্তি সকালে উঠে গিয়ে লাকড়ি সংগ্রহ করে তা নিজের পিঠে বহন করে এনে অপরকে দান করে এবং এ দিয়ে অপরের দ্বারস্থ হওয়া থেকে মুক্ত থাকে। তার এ কাজ মানুষের দরজায় দরজায় বেড়ানোর চেয়ে উত্তম- তারা কিছু দিক বা না দিক। কেননা উপরের হাত নীচের হাতের**

---

(১) ইমাম নববী রহঃ বলেন: "এখানে এই দুই প্রকার মানুষের নিন্দা করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ এসব নারী আল্লাহর বিভিন্ন নেয়ামতে পরিবেষ্টিত থাকবে, কিন্তু তারা এর শুকরিয়া আদায় থেকে মুক্ত থাকবে। কেউ বলেছেন: এর অর্থ হল তার শরীরের কিছু অংশ ঢেকে রাখবে আর কিছু অংশ প্রকাশ করে বেড়াবে। আবার কেউ বলেছেন: এর মানে হল যে সে পাতলা পোশাক পরিধান করবে যা তার শরীরের রঙ বর্ণনা করে।" দেখুন: শরহু সহীহ মুসলিম: ১৪/১১০।

চেয়ে উত্তম। যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত তাদের দিয়েই দান শুরু কর।)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

যখন এই ইসলামি নির্দেশাবলী সম্পর্কে মুসলমানদের সচেতনতা হ্রাস পেয়েছে, তখন আমরা মুসলিম দেশগুলিতে কিছু যুবককে ভিক্ষাবৃত্তি অনুশীলন করতে দেখি, যেন এটা অন্যান্য বৈধ পেশার মতো একটি পেশা। এটা শুধুমাত্র ইসলামের নৈতিকতা ও নির্দেশনা সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের কারণে। এটা তাদের নৈতিকতাকে এমন হীন স্তরে ফেলে দিয়েছে যা একজন মুসলমানের মর্যাদার সাথে বেমানান।

যেহেতু এটা পরিবার গঠন এবং জীবিকা অর্জনের জন্য একটি পেশা বেছে নেওয়ার পর্যায়, তাই ব্যক্তি তার পরিবারের নৈতিকতার বিষয়ে দায়বদ্ধ এবং তার পেশার ক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হয়। উপরন্তু, সে তার পরিবার ও সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই অবশ্যই তাকে ভাল নৈতিকতা সম্পন্ন হতে হবে, যেমন তার পরিবার ও চারপাশের লোকদের প্রতি সদয় হওয়া। নবী সাঃ বলেছেন: ((**হে আয়েশা! নিশ্চয় আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার উপরে যা দেন তা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম। তাকে অবশ্যই সেই অহংকার এড়িয়ে চলতে হবে যা সাধারণত যুবকদের সাথে থাকে যারা ইসলামী নির্দেশনা নিয়ে বেড়ে ওঠেনি। যেখানে দৈহিক, মানসিক ও পেশাগত সুস্থতার শক্তির গর্ব করা হয়, সেখানে ইসলাম মানুষকে নম্রতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শনে নির্দেশ দেয়। নবী সাঃ এ মর্মে বলেন: ((**যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহংকার? রাসূল সাঃ বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন। অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।**)) সহীহ মুসলিম। এই হাদিস থেকে জানা

যায় যে, কোনো ব্যক্তি অহংকার বা বাড়াবাড়ি ছাড়া তার পোশাকের সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখলে কোনো ক্ষতি নেই। এবং এটা চরিত্রের সৌন্দর্যের অংশ এবং বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহ বান্দার উপর তাঁর নেয়ামতের প্রভাব দেখতে পছন্দ করেন।**)) সহীহ মুসলিম।

- ইসলাম ব্যক্তিকে উত্তম নৈতিকতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয় যা সমাজের সদস্যদের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং সন্দেহ, গুপ্তচরবৃত্তি ও হিংসা-বিদ্বেষের মতো বিচ্ছিন্নতা ও ঘৃণার দিকে পরিচালিত করে এমন সবকিছুকে নিষিদ্ধ করে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করো না। কেননা, খারাপ ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা দোষ অন্বেষন করো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, পরস্পর হিংসা করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না। বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দারূপে ভাই ভাই হয়ে যাও।**)) সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

এসব গুণাবলী এই পর্যায়টির জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং একজন মুসলিম ব্যক্তির উচিত তার বিকাশের প্রথম পর্যায় থেকেই এগুলোর প্রতি অভ্যস্ত হওয়া, কিন্তু এই পর্যায়ে এগুলো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু একজন ব্যক্তি তার পরিবার ও সমাজের জন্য আদর্শ হয়ে উঠার পাশাপাশি মানসিক পরিপক্কতার কাছাকাছি থাকে, তাই এই পর্যায়ে যদি সে এসব গুণাবলীর অধিকারী না হয়, তবে আর কখন হবে?

ব্যবহারিক শিক্ষা:

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে মানানসই কিছু শিক্ষাগত নির্দেশনা নিম্নরূপ উপস্থাপন করা যেতে পারে:

- যুবক-যুবতীর জন্য বিবাহের খরচ সহজতর করা, যাতে তাদের সতীত্ব সংরক্ষিত হয়, তাদের বংশ রক্ষা ও বংশ বৃদ্ধি হয় এবং তাদের নৈতিকতা সমুন্নত থাকে।

মসজিদ ও মিডিয়া উভয়কেই এ বিষয়ে পরামর্শ, নির্দেশনা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে, যাতে সমাজে নৈতিক গুণাবলী বিরাজ করে এবং পাপাচার লোপ পায়।

- বিশ্ববিদ্যালয় এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট নৈতিকতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কাজ করা।
- মুসলিম ব্যক্তির জীবনে কাজের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং তাকে এতে উৎসাহিত করা। যুবকদের মাঝে ভিক্ষাবৃত্তিমূলক পেশার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সম্প্রদায়কে নির্দেশনা দেওয়া, যা বেকারত্ব ও অপরাধের দিকে পরিচালিত করে।
- বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু যুবক-যুবতীর মধ্যে যে অবাধ মেলামেশার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে তার বিরুদ্ধে সতর্কতা এবং সব উপায়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ।

ষষ্ঠ: বার্ধক্যকাল

এই পর্যায়টি নৈতিক গঠনমূলক দিকনির্দেশনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিনিধিত্ব করে। উপরন্তু, এটি পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোতে যারা আছে তাদের জন্য একটি উত্তম আদর্শেরও প্রতিনিধিত্ব করে। কারণ, এ পর্যায়ের ব্যক্তিরা জীবনে নানাবিধ সাধারণ অভিজ্ঞতা বহন করে, এছাড়াও তারা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনেক কিছুই শিখেছে ও অর্জন করেছে।

বার্ধক্যকাল সম্পর্কে ধারণা এবং শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

শাব্দিক বিশ্লেষণে (الشيخ) তথা বৃদ্ধ বলা হয় তাকে যার মাঝে বয়সের ছাপ স্পষ্ট, অথবা পঞ্চাশ বা একান্ন থেকে জীবনের শেষ বা আশি বছর বয়সের ব্যক্তি।[১]

বৃদ্ধ সম্পর্কে ইবনে মানযূর রহঃ বলেন: ((সেই ব্যক্তি যার মাঝে বয়সের ছাপ সুস্পষ্ট এবং চুল ধূসর আকার ধারণ করেছে। কেউ কেউ বলেছেন: পঞ্চাশ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত। আবার কেউ বলেছেন: একান্ন থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত। কেউ বলেছেন: পঞ্চাশ থেকে আশি বছর।))[২]

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٍ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلًا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمۡ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخٗاۚ﴾ [غافر: ٦٧]

---

(১) আল-কামূস আল-মুহিত: ১/২৬৩।

(২) লিসানুল আরব: ৩/৩১।

অর্থ: [তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর রক্তপিন্ড থেকে, তারপর তিনি তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, তারপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর যেন তোমরা হয়ে যাও বৃদ্ধ।] সূরা গাফির: ৬৭।

ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেন: ((বৃদ্ধ সেই ব্যক্তি যে চল্লিশ বছর পেরিয়েছে।))[১]

মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা দেখতে পাই যে, কেউ কেউ বার্ধক্যের পর্যায়কে কিছুটা বিলম্বিত করে উল্লেখ করে ষাট বছর বয়সের পরে নির্ধারণ করেছেন, যা নিম্নলিখিত ভাগ থেকে স্পষ্ট:

১– প্রারম্ভিক পূর্ণ যৌবন ২১ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত।

২- মধ্য বয়স: ৪০-৬০ বছর।

৩- বার্ধক্য ৬০ থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত।

যাইহোক, মনে হচ্ছে এই পর্যায়টি চল্লিশের পরে শুরু হয়, যেমনটি ইমাম কুরতুবী রহঃ উল্লেখ করেছেন; যখন একজন ব্যক্তির বয়স স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং সাধারণত ধূসর চুল দেখা যায়। তাছাড়াও আয়াতে এই পর্যায়ের ক্রমটি পূর্ণ যৌবনের পর্যায়ের পরে উল্লেখ হয়েছে যা চল্লিশ বছর বয়সে সম্পন্ন হয়। আর এ পর্যায়ের সমাপ্তি জীবনাবসানের সাথে শেষ হয়।

বার্ধক্যকালের কতিপয় বৈশিষ্ট্য:

এই পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ যারা শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতার পর্যায়ে পৌঁছায়নি তাদের মানসিক পরিপক্কতা, দূরদর্শিতা, নানা বিষয়ের যৌক্তিক বোঝাপড়া, বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং

---

(১) দেখুন: আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন: ১৫/২১৫।

স্বল্প আবেগের দিক থেকে কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যা তাদের নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে সাহায্য করে এবং তা তাদের মর্যাদা ও শালীনতা এনে দেয়।

এই পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোতে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

- শক্তির ক্রমশ হ্রাস। ইবনুল কাইয়্যিম রহঃ বলেন: (অতঃপর চল্লিশের পর তা কমতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে শক্তি দুর্বল হতে শুরু করে, যেমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল।)[১]
- কালানুক্রমিক বয়স বৃদ্ধির দ্বারা শেখার ক্ষমতা স্পষ্টভাবে প্রভাবিত হয় না।
- বড়দের যুক্তি ছোটদের যুক্তির চেয়ে সুস্পষ্ট। এটা তাদের বোঝাপড়া ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়। তবে এটা সর্বক্ষেত্রেই যে তা নয়। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত অবস্থা তাদের আচরণ ও যুক্তির উপর একটি বড় প্রভাব ফেলে। অতএব, বড়দেরকে শেখানোর পদ্ধতিটি পরিষ্কার হওয়া উচিত যা তাদের সামর্থ্যের জন্য উপযুক্ত।
- - বড়রা সম্পূর্ণ জিনিস উপলব্ধি করে এবং তারপরে এগুলোর মূল উপাদানগুলিতে সরাসরি বিশ্লেষণ করে।
- বৃদ্ধদের আবেগ যুবকদের তুলনায় অধিক প্রশস্ত ও তীব্র এবং কম শান্ত।
- আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এবং সবচেয়ে গুরুতর পরিস্থিতিতে সেটাকে ধরে রাখার ক্ষমতা, যেমনটি ইসলামী নির্দেশিকায় ব্যাখ্যা করা হবে।
- বৃদ্ধরা সমালোচনা পছন্দ করেন না এবং এতে কষ্ট পান। তারা তরুণদের তুলনায় আবেগে কম অস্থির থাকেন।
- দীর্ঘ আশা এবং বেঁচে থাকার ভালবাসা। অচিরেই এর ব্যাখ্যা করা হবে।

---

(১) তুহফাতুল মাওদূদ: পৃ: ১৭৮।

- এই পর্যায়ের শেষে মনস্তাত্ত্বিক সামঞ্জস্য দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ সামাজিক পরিবেশে তার অবস্থান ও উপস্থিতি সম্পর্কে ব্যক্তির অনুভূতি তার মনস্তাত্ত্বিক সমন্বয়কে প্রভাবিত করে, যা পরবর্তীতে তার আচরণেও প্রতিফলিত হয়। ফলে একজন বৃদ্ধের বয়স যতই বাড়তে থাকে ও বয়সের ভারে নত হয়, তার মাঝে ক্রমশ দুর্বলতার লক্ষণ দেখা দেয়। তখন ব্যক্তি তার চারপাশে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতাকে অতিক্রম করে এমন গতিতে চারপাশের পরিবর্তনশীল সমাজে তার অবস্থান বজায় রাখা খুব কঠিন বলে মনে করে।

ফলে সামাজিক পরিবর্তন, বস্তুগত লাভ, এবং তার চারপাশের লোকদের নিজস্ব বিষয় নিয়ে ব্যস্ততা ব্যক্তির উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, যা তার আচরণে প্রদর্শিত হয়। এই পর্যায়ের সমস্যটি অনৈসলামিক সমাজে দেখা যায়, যেখানে বয়স্কদের প্রতি কম মনোযোগ দেওয়া হয় এবং সন্তানেরা তাদেরকে সোস্যাল কেয়ার হোমে রেখে আসে। কারণ, তাদের ইহতেরাম ও সম্মানের মানদন্ড বস্তুগত সুবিধার উপর ভিত্তি করে।

বস্তুত বয়স্ক ব্যক্তিরা দয়া, সহানুভূতি ও মর্যাদার প্রতি সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী এবং তারাই এর সবচেয়ে বেশি যোগ্য; পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোতে তারা যে অবদান রেখেছিলেন তার বিনিময়ে, উপরন্তু এটা ধর্মীয় দায়িত্বও বটে যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে। অতএব, আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী নির্দেশনাই সমাজে তাদের সম্মান ও মর্যাদার জন্য সর্বোত্তম পথপ্রদর্শক ও রক্ষাকারী।

একজন ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সামঞ্জস্যতা অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বিশুদ্ধ আক্বীদা। সঠিক ঈমান ব্যক্তিকে বাস্তবতায় সন্তুষ্ট করে এবং ব্যক্তি ও তার চারপাশের পরিবেশে বস্তুগত ও নৈতিক দৃশ্যাবলীর মাঝে মনস্তাত্ত্বিক সামঞ্জস্যতা

নিশ্চিত করে, যা তাকে মানসিক প্রশান্তি দেয় এবং অন্যদের সাথে তার প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

অনুরূপভাবে সঠিক ঈমান এই পর্যায়ের শেষ অবস্থাগুলোতে সমস্ত জৈব, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যতা বিধানে ও তা মেনে নেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করে।

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা:

ইসলাম এই পর্যায়ের মানুষের আচরণকে তাদের মর্যাদা এবং অন্যদের আচরণের উপর তাদের প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে নির্দেশ করেছে। কারণ, তারা দায়িত্বের বাহক এবং দায়িত্ববানকে অবশ্যই এমন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে হবে যা তাকে এর যোগ্য করে তোলে। অনুরূপভাবে ইসলাম তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মানিত করেছে; তাদেরকে মুল্যায়ন ও সম্মান প্রদর্শন করাকে অন্যদের উপর আবশ্যক করার মাধ্যমে। ঐ সকল ইসলামী নির্দেশনার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হল:

- বয়স্ক ব্যক্তি বিয়ের মাধ্যমে সতীত্বের সুরক্ষা অর্জন করেছেন এবং এই পর্যায়ের শেষে তার যৌন প্রবণতা দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তবে এটা তাকে আল্লাহর কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করবে। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাঃ যৌন কেলেঙ্কারীর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন, বিশেষ করে বার্ধক্যকালে। আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন: ((**তিন ব্যক্তি যাদের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন**

না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি: ব্যভিচারী বৃদ্ধ, মিথ্যাবাদী রাজা এবং অহংকারী দরিদ্র।[১])) সহীহ মুসলিম।

ইমাম নববী রহঃ বলেন: ((কাযী ইয়াজ রহঃ বলেছেন: "এর কারণ হল যে, এদের প্রত্যেকেই পূর্বোক্ত গোনাহ করেছে- সেগুলো থেকে দুরত্ব থাকা, প্রয়োজন না থাকা ও এসব করার দুর্বল কারণ সত্ত্বেও। যদিও কেউ পাপ থেকে মুক্ত নয়, কিন্তু যেহেতু এই পাপের জন্য কোন বিরক্তিকর প্রয়োজনীয়তা বা স্বাভাবিক কারণ ছিল না, সেহেতু তাদের এ কাজে অগ্রসর হওয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহর অধিকারের প্রতি বিরোধিতা, ঘৃণা এবং অন্য কোন কারণ ছাড়াই তাঁর অবাধ্যতার অভিপ্রায়ের অনুরূপ। যেহেতু বৃদ্ধ ব্যক্তির বিবেকের পরিপূর্ণতা ও দীর্ঘ সময়ের জন্য তার জ্ঞানের পূর্ণতা রয়েছে এবং সহবাস ও মহিলাদের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষার কারণগুলোর দুর্বলতার কারণে, তার কাছে এর বৈধ উপায় থাকে যা তাকে এ থেকে মুক্তি দেয় এবং তার গোপনীয়তায় স্বস্থি দেয়। তাহলে হারাম ব্যভিচারের পরিণতি কেমন হতে পারে? অথচ সাধারণত এর কারণ হল: যৌবন, সহজাত উত্তেজনা, জ্ঞানের অভাব এবং বিবেকের দুর্বলতা ও তরুণ বয়সে প্রবৃত্তির তাড়না।))[২]

রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**আল্লাহ তায়ালা যাকে দীর্ঘায়ু করেছেন, এমনকি যাকে ষাট বছরে পৌছিয়েছেন তার ওযর পেশ করার সুযোগ রাখেননি।**)) সহীহ বুখারী।

---

(১) ইমাম নববী রহঃ বলেন: (দরিদ্র ব্যক্তির অর্থের অভাব থাকতে পারে। তাছাড়া অহংকার, গর্ব ও সমসাময়িকদের উপরে শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম কারণ হল এই পৃথিবীর সম্পদ যা সে মালিক হয়েছে এবং অন্যরা তার মুখাপেক্ষী। যখন তার কাছে এই কারণটি অনুপস্থিত তাহলে কেন সে অহংকার করবে এবং অন্যকে তুচ্ছ করবে? ফলে তার এ কাজ এবং ব্যভিচারী বৃদ্ধ ও মিথ্যাবাদী শাসকের কর্মকাণ্ড আল্লাহর হকের প্রতি অবজ্ঞার একটি রূপ মাত্র।) শরহু সহীহ মুসলিম: ১/১১৭।

(২) শরহু সহীহ মুসলিম: ২/১১৭।

যেহেতু বয়স্ক ব্যক্তি দুনিয়া ও অর্থের প্রতি অনুরাগী, এবং একই সাথে তিনি অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও সচেতন এবং তার ইচ্ছা ও আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন, তাই তার উচিত নয় দুনিয়া ও অর্থের প্রতি এতটাই আগ্রহী হওয়া যে, তা আল্লাহর উপাসনা থেকে তার হৃদয়কে ব্যস্ত রাখে। ইমাম মুসলিম রহঃ একটি অধ্যায় রচনা করেছেন: "পার্থিব সম্পদের প্রতি লোভ করা অপছন্দনীয়", এবং এর অধীনে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**বৃদ্ধ মানুষের হৃদয় দুটি বস্তুর ভালবাসার ব্যাপারে অত্যন্ত তরুণ ১. জীবনের মায়া ও ২. ধন সম্পদের মায়া।**)) ইমাম নববী রহঃ বলেন: ((এর অর্থ হল: বৃদ্ধ ব্যক্তির অন্তর অর্থকড়ির প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকে, যৌবনকালে যুবকের শক্তির মতো এর দ্বারা পরিচালিত হয়।)) আর অর্থকড়ি সংগ্রহের নেশায় বয়স্ক ব্যক্তির মত্ত থাকা হয়ত তাকে তার সন্তানদের পরিচালনা ও লালনপালন থেকেও ব্যস্ত রাখতে পারে। ফলে তিনি তাদের বিপথগামী করে ফেলতে পারেন এবং এর ফলে তাদের লালন-পালনের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেন। তিনি তাদের বিচ্যুতির জন্যও দায়ী হবেন। কাজেই একজন পিতার জন্য তার সন্তানদের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করা ইসলামী শিষ্টাচার নয়।

এই পর্যায়ে ইসলামী শিষ্টাচারের মধ্যে রয়েছে যে, বৃদ্ধ ব্যক্তি তার ধূসর চুলের শুভ্রতা পরিবর্তন করবেন, তবে কালো করা পরিহার করবেন। আনাস রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা বার্ধক্যের শুভ্রতা পরিবর্তন করে দাও, তবে কালো রঙ্গের ধারেকাছে যাবে না।**)) মুসনাদে আহমাদ; ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে সাদা চুল উপড়ে ফেলাও উচিত নয় যেমনটি কেউ কেউ করে থাকে। কারণ, ধূসর চুল মর্যাদার প্রতীক এবং একজন মুসলমানের জন্য জ্যোতী স্বরূপ। রাসূল সাঃ বলেছেন: ((**তোমরা পাকা চুল-দাঁড়ি উপড়িয়ে ফেলো না। কেননা কোনো মুসলিম ইসলামের মধ্যে থেকে চুল পাকালে এটা তার জন্য কিয়ামতের দিন**

উজ্জ্বল নূর হবে। আল্লাহ তার প্রতিটি পাকা চুলের পরিবর্তে তাকে একটি নেকী দান করবেন এবং একটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন।)) সুনানে আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদ।

- যে ব্যক্তি এই পর্যায়ে প্রবেশ করেছে তাকে ইসলামের শিষ্টাচারের প্রতি আরও বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া উচিত, যদিও এটি সমস্ত পর্যায়ে প্রয়োজন, তবে এই পর্যায়ের ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: **((একদা আমরা রাসূল সাঃ-এর নিকট ছিলাম, তখন এক যুবক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিতে পারব? তিনি বললেন: না। তারপর একজন বৃদ্ধ এসে বললেন, আমি কি রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দিতে পারব? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তখন আমরা পরস্পরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে লাগলাম। রাসূল সাঃ বললেন: আমি বুঝতে পাচ্ছি তোমরা কেন একে অপরের দিকে তাকাচ্ছ। বস্তুত বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে।))** মুসনাদে আহমাদ। আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: **((জনৈক ব্যক্তি নবী সাঃ-এর নিকট রোযা থাকাবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে এর অনুমতি প্রদান করেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি এসে অনুমতি চাইলে তিনি তাকে নিষেধ করেন। ব্যাপার এই ছিল যে, তিনি যাকে অনুমতি প্রদান করেন সে ছিল বৃদ্ধ, আর যাকে নিষেধ করেন সে ছিল যুবক।))** সুনানে আবু দাউদ।

অন্যদিকে, আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী নির্দেশাবলী এই পর্যায়ে বয়স্ক ব্যক্তিকে তার যথোপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান দেয়। ছোটদের নির্দেশ দেয় বড়দের সম্মান করতে, সন্তানদের নির্দেশ দেয় তাদের পিতামাতার যত্ন নিতে, তাদের সহযোগিতা করতে ও তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতে, এবং সন্তানদের দ্বারা যেন এমন কিছু না ঘটে যা তাদের বিরক্ত করে। পিতামাতা ও বড়দের প্রতি সন্তানদের জন্য ইসলামী নির্দেশাবলীর মধ্যে রয়েছে:

- ইসলাম সন্তানদেরকে বড়দের সম্মান করার আহ্বান জানিয়েছে। কারণ, এটা বৃদ্ধ বয়সে তার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তাকে তার মর্যাদা ও অবস্থান অনুভব করায়। আর এটা ইসলামের মহৎ নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন: ((**স্বপ্নে দেখলাম, আমি মিসওয়াক করছি। তখন দুই ব্যক্তি এসে আমাকে টেনে ধরল। একজন বড় এবং অপরজন ছোট। অতঃপর তাদের ছোটজনকে আমি আমার মিসওয়াকটি দিতে গেলাম, তখন আমাকে বলা হল, বড়কে দাও। তখন সেটি আমি বড়জনকে দিয়ে দিলাম।**)) সহীহ মুসলিম। সাহল বিন সাদ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ((**নবী সাঃ-এর কাছে কিছু পানীয় হাযির করা হল। সেখান থেকে তিনি নিজে পান করলেন। তার ডান পার্শ্বে ছিল এক যুবক আর বাম পার্শ্বে ছিলেন বয়োবৃদ্ধগণ। তখন তিনি যুবককে বললেন, এ বয়স্ক লোকদেরকে আগে পান করতে দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দিবে কি? তখন যুবকটি বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ পানির পেয়ালাটা তার হাতে ঠেলে দিলেন।**)) সহীহ বুখারী।

প্রথম হাদিসটি সম্পর্কে ইবনে বাত্তাল রহঃ বলেন: ((এতে মিসওয়াকের ক্ষেত্রে বড়দেরকে অগ্রাধিকার প্রদান রয়েছে এবং খাদ্য, পানীয়, হাঁটা-চলা ও কথা বলাও এর সাথে যুক্ত।)) আল-মুহাল্লাব রহঃ বলেন: ((এটি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ লোকেরা বসার সময় নিজেদেরকে সাজিয়ে না নেয়। যদি তারা নিজেদেরকে সাজিয়ে নেয়, তবে সেক্ষেত্রে সুন্নাহ হল ডান দিককে অগ্রাধিকার দেয়া এবং এ পদ্ধতিই সঠিক।)) কথা বলা ও সম্বোধনের আরেকটি শিষ্টাচার হল: ছোটদের উপর বড়দেরকে প্রাধান্য দেয়া। ইমাম বুখারী রহঃ একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবে: "অধ্যায়: বড়দেরকে সম্মান করা এবং যিনি বড় তিনি প্রথমে কথা বলবেন ও জিজ্ঞাসা করবেন"। তিনি এর অধীন আব্দুল্লাহ বিন সাহল ও মুহাইয়্যিসা রাঃ সম্পর্কিত হাদিসটি উল্লেখ

করেছেন: ((**একবার আবদুল্লাহ বিন সাহল ও মুহাইয়্যিসা বিন মাসউদ রাঃ খায়বারে পৌছে উভয়েই খেজুরের বাগানের ভিন্ন ভিন্ন পথে চলে গেলেন। সেখানে আবদুল্লাহ বিন সাহল রাঃ-কে হত্যা করা হল। এ ঘটনার পর আবদুর রহমান বিন সাহল ও ইবনে মাসউদ রাঃ-এর দুই ছেলে হুওয়াইসা ও মুহাইয়্যিসা রাঃ নবী সাঃ-এর কাছে এলেন এবং তার কাছে নিহত ব্যক্তির কথা বলতে লাগলেন। আবদুর রহমান রাঃ কথা শুরু করলেন। তিনি ছোট ছিলেন, নবী সাঃ তাদের বললেন: তুমি বড়দের সম্মান দাও। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া বলেন: কথা বলার দায়িত্ব যেন বড়রা পালন করে। তখন তারা তাদের লোক সম্পর্কে কথা বললেন।**)) সহীহ বুখারী।

- ইসলামী নৈতিকতার অন্যতম হল: বড়রা ছোটদের প্রতি করুণা করবে, এবং ছোটরা বড়দের অধিকার জানবে; ফলে বয়সে বড় হওয়ায় তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। নবী সাঃ বলেছেন: ((**সে ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান স্বীকার করে না।**)) সুনানে তিরমিযি। পূর্বোক্ত দুটি হাদিস থেকে যা শেখা যায় তার অন্যতম হল: ইসলামী নৈতিকতা নির্দেশ করে যে, একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে তার চেয়ে ছোটদের প্রতি দয়াশীল ও সদয় হতে হবে। যাতে তারা তার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়, তার আচরণ অনুকরণ করে এবং তার পরামর্শ ও নির্দেশনা শুনে। কারণ রূঢ়তা ও কঠোরতা বিভাজনের দিকে নিয়ে যায় এবং বড় ও ছোটদের মধ্যে ব্যবধানকে প্রশস্ত করে। ছোটদের অবশ্যই বড়দেরকে সম্মান করতে হবে এবং তাদের কথা বলা, হাঁটাচলা, দেয়া ও অন্যান্য বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ছেলেমেয়ে ও পিতামাতার জন্য বিশেষ কিছু নৈতিক নির্দেশনা রয়েছে, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣ وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤]

অর্থ: [**আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।* আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'।**] সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩-২৪।

অর্থাৎ: ((মৌখিক এবং বাস্তব সব ধরনের উদারতায় তাদের প্রতি সদয় হবে। কেননা, তারাই বান্দার অস্তিত্বের কারণ। তাছাড়া তাদের সন্তানের প্রতি ভালবাসা, দয়া ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে, যার জন্য তার অধিকার নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন।))[১] "তাদেরকে একটি খারাপ শব্দও শুনাবে না, এমনকি 'উফ' শব্দও না, যা বাজে শব্দাবলীর মধ্যে খুবই হালকা শব্দ।"[২]

[**তাদেরকে ধমক দিও না।**] অর্থাৎ: ক্রোধ নিয়ে তাদের সাথে কথা বলবে না, তাদের সামনে চিৎকার করে উঠবে না। আতা ইবনে আবি রাবাহ রহঃ বলেছেন: "তাদের গায়ে হাত তুলবে না।" [**আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।**] অর্থাৎ: যথাসম্ভব নম্র ও কোমল ভাষায় কথা বল। [**আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ**

(১) তাফসীরে সা'দী: ৩/১০৩।

(২) তাফসীর ইবনে কাসীর: ৩/৩৭।

হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও] অর্থাৎ: তাদের প্রতি অবনত হয়ে বিনয়তা ও দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন কর, সওয়াবের প্রত্যাশায়। [**এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'**।] অর্থাৎ: তাদের জীবিত ও মৃত উভয়ের জন্য জন্য রহমতের প্রার্থনা কর, তোমার শৈশবকালে তোমাকে যেভাবে লালন-পালন করেছে তার প্রতিদান স্বরূপ।[১]

ব্যবহারিক শিক্ষা:

- বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত ঈমানী পাঠ তৈরিতে অবদান রাখা, যা বান্দাকে তার প্রভুর নিকটবর্তী করে এবং তাকে পাপ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে।
- বয়স্কদের অধিকার সংরক্ষণ করে এমন ইসলামী নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করা, তাদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত শিষ্টাচার সুস্পষ্ট করা এবং তা মেনে চলার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া।
- দিকনির্দেশনামূল সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উচিত, বয়স্কদেরকে তাদের এই পর্যায়ে শিক্ষিত করা। তাদেরকে তাদের নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা, যা তাদের অবহেলা করা উচিত নয়, তারা ছোটদের জন্য রোল মডেল এবং তাদের দায়িত্বও দ্বিগুণ। আর এটা মিডিয়া, সেমিনার, বক্তৃতা ও উপদেশের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

---

(১) তাফসীরে সা'দী: ৩/১০৪।

উপসংহার

মানুষের জীবন বিকাশের পর্যায়গুলো যা সে তার জীবনব্যাপী অতিক্রম করে, তা পর্যালোচনার পর সুস্পষ্ট হল যে, এসব পর্যায়গুলোর নানা বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ রয়েছে।

ইসলাম এই পর্যায়গুলোকে শিক্ষাগত দিকনির্দেশনা দিয়েছে যা প্রতিটি পর্যায়ের কালানুক্রমিক যুগের সাথে এবং এর বিশেষত্ব ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা এটা মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম এটাকে এর বিভিন্ন দিক থেকে এমনভাবে ব্যবহার করেছে যাতে সমসাময়িক শিক্ষা পদ্ধতি পৌঁছাতে পারে না বা এর কাছাকাছি আসতে পারে না। যেমন চরিত্রগত দিক, ইসলাম এটাকে প্রত্যেক পর্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে চারিত্রিক শিষ্টাচার ও গুণাবলীর প্রচারের অনুশীলন করেছে। অপরদিকে নৈতিক অবক্ষয়মূল অপরাধ কর্মকান্ড পরিহারে নির্দেশনার প্রতিবিধান করেছে যা বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতা এবং পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয় ঘটায়। বস্তুত কাফের দেশগুলো এই স্তরে পৌঁছেছে; পাপাচারের বিস্তৃতি, উত্তম নৈতিকতার অভাব, বয়স্ক ও দরিদ্রদের প্রতি অবজ্ঞা এবং ক্ষমতার মান অনুযায়ী আচরণ- তা অর্থনৈতিক শক্তি অথবা শরীরিক বা জ্ঞান-বুদ্ধিগত কাঠামো যাই হোক না কেন। একজন ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা নির্ভর করে তার বস্তুগত শক্তি বা সামাজিক অবস্থানের উপর!

বিকাশের পর্যায়গুলো অধ্যয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকারিতা হল, এমন জ্ঞান অর্জন যা মানব বিকাশের বৈশিষ্ট্যাবলীর শারীরিক, জ্ঞানগত, উপলব্ধিগত ও আচরণগত দিকগুলো শিক্ষাবিদদের কাছে স্পষ্ট করে, যা নৈতিকতার পরিচায়ক। অনুরূপভাবে মানসিক ও আবেগজনিত দিকগুলোও প্রকাশ করে যা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে। শিক্ষক এই দিকগুলো জানার মাধ্যমে, তিনি লোকদেরকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে গাইড করতে, বিকাশ করতে এবং তাদের সাথে আচরণ করতে পারেন।

কারণ, একজন বয়স্ক ব্যক্তির সাথে আচরণ করা একজন শিশু বা যুবকের থেকে আলাদা। বরং প্রত্যেকের সাথে তার বুঝ, ক্ষমতা ও তার গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে আচরণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি একজন ছোট ছেলেকে আপনার জন্য কিছু বহন করতে বা আপনার সাথে প্রয়োজনীয় কিছু বহন করে নিয়ে যেতে বলতে পারেন, কিন্তু আপনি আপনার চেয়ে বয়স্ক কারো কাছে তা চাইতে বিব্রতবোধ করবেন। আবার অন্যদিকে, আপনি একজন বয়স্ক ব্যক্তির কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চাইতে পারেন, কিন্তু একজন কম বয়সী ছেলের সাথে পরামর্শ করবেন না, কারণ সে এটা বোঝে না তাই। একইভাবে, আপনি যখন একজন বাচ্চাকে নির্দেশনা দেন, তখন আপনি আদেশমূলক শব্দ ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু আপনি এটা আপনার চেয়ে বয়স্ক কারও সাথে ব্যবহার করতে পারবেন না। আপনি কখনও কখনও আপনার সমবয়সী কারও সাথে এরূপ ব্যবহার করতে পারেন, আবার কখনো তা করতে পারেন না। প্রতিটিই তার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে।

আর এ জন্যই বিকাশের পর্যায়গুলোর বৈশিষ্ট্য এবং শিক্ষাগত নির্দেশিকা প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

هذا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সূচীপত্র

ভূমিকা.....

প্রথমত: দুগ্ধপানকাল.....

দুগ্ধপানকাল সম্পর্কে ধারণা.....

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যাবলী.....

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা.....

ব্যবহারিক শিক্ষা.....

দ্বিতীয়ত: শৈশবকাল (নার্সারি পর্যায়).....

শৈশবকাল সম্পর্কে ধারণা.....

এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যাবলী.....

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা.....

ব্যবহারিক শিক্ষা.....

তৃতীয়ত: (تمييز) বাল্যকাল (ভালমন্দ যাচাইয়ের বয়সকাল).....

বাল্যকাল সম্পর্কে ধারণা.....

এ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যাবলী.....

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা.....

ব্যবহারিক শিক্ষা.....

চতুর্থত: প্রাপ্তবয়স্ককাল .....

বয়ঃসন্ধি ও প্রাপ্তবয়স্ক সম্পর্কে ধারণা.....

বয়ঃপ্রাপ্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ:.....

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা.....

ব্যবহারিক শিক্ষা.....

পঞ্চমত: যৌবনকাল (পরিপক্কতা অর্জনের পর্যায়) .....

(الرشد) বিচারবোধ, (الأشد) শক্তি সামর্থ্য ও (الشباب) যৌবন সম্পর্কে ধারণা:

যৌবনকালের বৈশিষ্ট্যাবলী.....

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা.....

ব্যবহারিক শিক্ষা.....

ষষ্ঠ: বার্ধক্যকাল.....

বার্ধক্যকাল সম্পর্কে ধারণা.....

বার্ধক্যকালের কতিপয় বৈশিষ্ট্য.....

এই পর্যায়ের জন্য ইসলামী নির্দেশনা.....

ব্যবহারিক শিক্ষা.....

উপসংহার.....

সূচীপত্র.....